লিলুয়া বাতাস

হুমায়ূন আহমেদ

দীর্ঘদিন কেউ আমার পাশে থাকে না, একসময় দূরে সরে যায়।
হঠাৎ হঠাৎ এক আধজন পাওয়া যায় যারা ঝুলেই থাকে, যেমন অভিনেতা ফারুক। লিলুয়া বাতাস বইটি তার জন্যে।
পরম করুণাময় তার হৃদয়ে লিলুয়া বাতাস বইয়ে দেবেন, এই আমার শুভ কামনা।

ফারুক আহমেদ
সুকনিষ্ঠেষু

অষ্টম মুদ্রণ | জুন ২০০৬
সপ্তম মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৬
ষষ্ঠ মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৬
পঞ্চম মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৬
চতুর্থ মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৬
তৃতীয় মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৬
প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০০৬

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৬৮১

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ১১০ টাকা
১৮০ টাকা (সিডিসহ)

আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

Lilua Batash | By Humayun Ahmed
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk.110.00
Tk.180.00 (Including CD)

ISBN : 984 868 383 6



আমার বড়খালা কিছুদিন হলো ভূত দেখছেন। ঠাট্টা না, সত্যি! ভূতগুলি তাঁর শোবার ঘরের চিপায় চাপায় থাকে। তাঁকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে। তিনি ধমক দিয়ে তাদের বের করে দেন। এই তো কিছুক্ষণ আগের কথা, আমি আমার ঘরে বসে জুতা ব্রাস করছি (আমার জুতা না, বাবার জুতা। তিনি আয়নার মতো ঝকঝকে জুতা ছাড়া পায়ে দেন না), তখন শুনলাম বড়খালা কাকে যেন ধমকাচ্ছেন। চাপা গলায় ধমক। আমি জুতা হাতেই বড়খালার ঘরে ঢুকে দেখি— তিনি খাটের সামনে উবু হয়ে বসে আছেন। তাঁর হাতে একটা শলার ঝাড়ু। তিনি ঝাড়ু নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলছেন, বের হ বলছি। বের হ। পুলাপান ভর্তি বাড়ি। তুই এদের ভয় দেখাবি? ঝাড়ু মেরে আজ তোর বিষ নামায়ে দেব। বদমাশ!

আমি বললাম, কার সঙ্গে কথা বলছ?

বড়খালা বললেন, বাবলু, জুতা দিয়ে তুই এর গালে একটা বাড়ি দে তো। এমন বাড়ি দিবি যেন এর চাপার দাঁত নড়ে যায়। বদমাইশটা খাটের নিচে।

আমি খাটের নিচে উঁকি দিলাম। দু'টা ট্রাংক, একজোড়া স্যান্ডেল, একটা টিফিন কেরিয়ার এবং প্লাস্টিকের ছোট লাল বালতি ছাড়া আর কিছু নেই। আমি বললাম, খালা, কিছু দেখছি না তো।

খালা স্বাভাবিক গলায় বললেন, চলে গেছে! এর ভাগ্য ভালো। জুতার বাড়ি খাওয়ার আগেই গেছে।

আমি বললাম, জিনিসটা কী?

খালা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, পিচকা ভূতটা। এইটাই বদের হাড্ডি। বাবলু, টিভিটা ছাড় তো। আর পিছনের পর্দা টেনে দে। তোর মাকে বল আমাকে কড়া করে যেন এক কাপ চা দেয়। চিনি কম দিতে বলবি। এরা চা ঠিকমতো বানাতে পারে না। আধা কাপ চায়ে চিনি দেয় তিন চামচ। এক চুমুক দিলে কলিজা পর্যন্ত মিষ্টি হয়ে যায়।

আমার খালার নাম মাজেদা বেগম। গত সাত বছর ধরে তিনি এবং তাঁর বড়ছেলে জহির আমাদের সঙ্গে থাকেন। খালার স্বভাবে আচার-আচরণে কোনো রকম অস্বাভাবিকতা নেই। শুধু মাঝে-মধ্যে ভূত দেখেন, এই ভূত দেখার মধ্যেও কোনো বাড়াবাড়ি নেই। হৈচৈ চিৎকার নেই। যেন ভূত-প্রেতের দেখা পাওয়া মানব জীবনের স্বাভাবিক ঘটনার একটি।

খালার সময় কাটে টিভিতে হিন্দি সিরিয়াল দেখে এবং পুরনো ম্যাগাজিন পড়ে। নতুন ম্যাগাজিন তিনি পড়তে পারেন না। আমি একবার তাকে দু'টা নতুন সিনেমা ম্যাগাজিন কিনে এনে দিয়েছিলাম। তিনি পড়েন নি। খাটের পাশে রেখে দিয়েছিলেন। কেউ আগে পড়বে, ময়লা করবে, পাতা কুঁচকাবে, তারপর তিনি পড়বেন। তার আগে না।

এটাকে তাঁর চরিত্রের অস্বাভাবিকতা বলা ঠিক হবে না। নতুন ম্যাগাজিন তিনি পড়তে পারেন না, কারণ খালু সাহেব এই বিষয়টা পছন্দ করতেন না। ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ তিনি আগে পড়তেন, তারপর অন্যরা পড়তে পারত। ভুলে কেউ যদি তার আগে খবরের কাগজ পড়ে ফেলত, তিনি চিৎকার চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তুলতেন। নতুন খবরের কাগজ কিনিয়ে আনতেন, আগেরটা ছুঁয়ে দেখতেন না।

খালু সাহেব (মিজানুর রহমান খান, চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্ট) রোড অ্যাকসিডেন্টে সাত বছর আগে মারা গেছেন। কিন্তু তাঁর তৈরি করা নিয়মকানুন বড়খালার মধ্যে রেখে গেছেন। ঐ যে কবিতাটা আছে না— পাখি উড়ে চলে গেলে পাখির পালক পড়ে থাকে। খালু সাহেব উড়ে চলে গেছেন, কিন্তু পুরনো ম্যাগাজিন রেখে গেছেন।

খালু সাহেবের ব্যাপারটা পরে বলব, আগে বড়খালার বিষয়টা শেষ করি। আগেই বলেছি, বড়খালার বয়স পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু বয়সের কোনো দাগ তাঁর চেহারায় পড়ে নি। মোটাসোটা থলথলে একজন মানুষ। সুখী সুখী চোখ-মুখ। জর্দা দিয়ে পান খেতে পছন্দ করেন। সব ধরনের জর্দা না, ময়মনসিংহের মিকচার জর্দা কিংবা ইন্ডিয়ান গোপাল জর্দা। জর্দা খাবার সময় পানের রস তাঁর থুতনি গড়িয়ে প্রায় পড়ে পড়ে যখন হয় তখন তিনি 'শোঁ' করে টেনে সেই রস মুখে নিয়ে নেন। এই দৃশ্যটা খুব সুন্দর।

তাঁর গায়ের রঙ ফর্সা, মেমসাহেবদের মতো ফর্সা। মেমসাহেবদের স্বভাবের সঙ্গেও তাঁর মিল আছে। তিনিও মেমসাহেবদের মতো গরম সহ্য করতে পারেন না। শীতের সময়ও তাঁর ঘরে এসি চলে। (একমাত্র বড়খালার ঘরেই এসি আছে। এরিস্টন কোম্পানির দেড়টনি এসি। যখন চলে ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়। মনে হয় ভোমড়া উড়ছে।)

দিনরাত এসি চলার কারণে তাঁর ঘর ফ্রিজের ভেতরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। তারপরেও তাঁর গরম যায় না। তিনি কোনোমতে একটা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে রাখেন। শাড়ির নিচে পেটিকোট-ব্লাউজ কিছুই পরেন না। সেই শাড়িও যে সবসময় গায়ে লেপ্টে থাকে তা-না। উপরের অংশ যখন-তখন নেমে কোমরের কাছে চলে আসে। বড়খালা তা নিয়ে মাথা ঘামান না। আমাদের বাড়ির সবাই বড়খালাকে এই অবস্থায় অনেকবার দেখেছে। সবচে' বেশি দেখেছি আমি। বয়সে ছোট বলে বড়খালা কখনো আমাকে গুনতির মাঝেই ধরতেন না। এখন আমি বড় হয়েছি। এইবার এসএসসি দেব। এখনো তিনি আমাকে গুনতিতে ধরেন না।

বড়খালার গরম বিষয়ক জটিলতার সঙ্গে আমরা পরিচিত বলে আমাদের কাছে বড়খালার 'অর্ধনগ্ন' সমস্যা কোনো সমস্যা না। বাড়িতে নতুন লোকজন এলে তারা ঝামেলায় পড়ে। কাজের মেয়ে জিতুর মা আমাদের বাড়িতে প্রথম কাজ করতে এসেই চোখ কপালে তুলে বলল, ও আল্লা, দোতলার ঘরে এক বেটি নেংটা হইয়া বইসা আছে!

বাবা তখন নাশতা খাচ্ছিলেন। তিনি টেবিল থেকে উঠে এসে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, হোয়াট! এত বড় কথা। তুমি কানে ধর। কানে ধরে দশবার উঠবোস কর।

জিতুর মা বলল, আমি কানে ধইরা উঠবোস করব কী জন্যে? আমি করছি কী?

তুমি একজন সম্মানিত মহিলার সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলেছ, এইজন্যেই তুমি কানে ধরে দশবার উঠবোস করবে। যদি না কর তোমার চাকরি নট।

জিতুর মা তেজি গলায় বলল, চাকরি নট হইলে নট। আমি ফুলপুরের মাইয়া। ফুলপুরের মাইয়া কানে ধইরা উঠবোস করে না।

বাবা বললেন, তাহলে বিদায়। এক্ষুনি বিদায়। তোমরা এই মেয়ের ট্রাংক কাঁথা বালিশ, ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখ। আমার ধারণা সে ইতিমধ্যেই কিছু জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলেছে। ফুলপুর ময়মনসিংহ ডিসট্রিক্টে। ময়মনসিংহের কাজের মেয়ে চোরের হাড্ডি।

জিতুর মা'কে সকাল নটায় বিদায় করে দেওয়া হলো। সেদিন সন্ধ্যাতেই বাবা তাকে বস্তি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। পঞ্চাশ টাকা বাড়তি বেতন দিয়ে আনতে হলো। ঢাকা শহরে কাজের মেয়ের খুব অভাব। গ্রাম থেকে শত শত মেয়ে শহরে আসে ঠিকই, কিন্তু তারা বাসা বাড়িতে ঢোকে না। সরাসরি গার্মেন্টসে চলে যায়।

জিতুর মা অনেকদিন আমাদের মাঝে ছিল। শেষের দিকে বড়খালার সঙ্গে তার খুবই খাতির হয়। তারা দু'জন একসঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হিন্দি সিরিয়াল দেখত। জিতুর মা হিন্দি বুঝত না। বড়খালা বুঝিয়ে দিতেন।

শালগিরা হলো জন্মদিন। ঐ যে হ্যাপি বার্থ ডে। বুঝেছ ?

জি বুঝেছি।

ঐ লম্বা মেয়েটার আজ শালগিরা। সে দুনিয়ার বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত দিয়েছে, তার বয়ফ্রেন্ডকে দাওয়াত দেয় নাই। বুঝেছ ?

কাজটা অন্যায্য হইছে।

মোটেই অন্যায্য হয় নাই। ঠিকই হয়েছে। আমি হলেও তাই করতাম। তুমি কী করতে ?

খালাজি, আমি দাওয়াত দিতাম। দশজনরে দিতে পারছি, আরেকজন 'অ্যাস্ট্রা' দিলে ক্ষতি কী ?

জিতুর মা কথাবার্তায় দু'একটা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে। যেমন— 'অ্যাক্সট্রা', 'মিসটেক', 'রিস্কি'। সে আমাদের সঙ্গে তিন বছর ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে যায়। যাবার সময় রান্নাঘর থেকে একটিন গরুর গোশতের শুঁটকি নিয়ে যায়। বিষয়টা বেশ রহস্যজনক— এত জিনিস থাকতে সে একটিন গরুর গোশতের শুঁটকি নিয়ে কেন পালাল ? গোশতের শুঁটকি বাবার খুব পছন্দের। কোরবানির গোশতের অনেকটাই বাবার জন্যে শুঁটকি বানিয়ে রাখা হতো।

বাবা শুঁটকির শোকেই বেশ কাতর হলেন। সেদিন তিনি কাজে গেলেন না। হামকি ধামকি করতে লাগলেন— এই পিশাচী ডাইনিকে আমি যদি জেলের ভাত না খাওয়াই তাহলে আমার নাম তোফাজ্জল হোসেন না। আমার নাম কুত্তা হোসেন। ঢাকা সাউথের এসপি জয়নাল আমার বাল্যবন্ধু। একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। সে অঙ্ক একেবারেই পারত না। তার হোমওয়ার্ক আমি করে দিতাম। মেট্রিক পরীক্ষার সময় তার সিট পড়ল আমার পিছনে। সে যেন অংকে পাশ করতে পারে এই জন্যে আমি একটা করে অঙ্ক করতাম, খাতাটা খুলে রাখতাম। জয়নাল অঙ্কটা টুকত, তারপর আমি অন্য অংকে হাত দিতাম। তাকে পাশ করাতে গিয়ে আমি অঙ্ক খারাপ করলাম। যেখানে লেটার মার্ক থাকার কথা সেখানে পেলাম বাহান্ন। অংকের কারণে আমার ফার্স্ট ডিভিশন মিস হয়ে গেল। যাই হোক, এটা কোনো ব্যাপার না, জিতুর মা'কে টাইট দেয়াটা হলো ব্যাপার। সে ঘুঘু দেখেছে। ফাঁদ দেখে নি। You have seen the bird, not the cage.

আমার বাবা তোফাজ্জল হোসেন খোন্দকার বোকা মানুষ না বুদ্ধিমান মানুষ, তা এখনো আমি ধরতে পারি না। তাঁর কথাবার্তা আচার আচরণ বোকার মতো। এদিক দিয়ে তিনি বোকা। কিন্তু বোকাদের কর্মকাণ্ডের পেছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। বাবার সমস্ত কর্মকাণ্ডের পেছনেই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে। বাইরের মানুষ বাবাকে তোফাজ্জল হোসেন বলে না। বলে 'টাউট হোসেন'।

খালু সাহেবের মৃত্যুর পর বাবা যে বড়খালাকে এ বাড়িতে এনে তুললেন তার পেছনেও উদ্দেশ্য কাজ করেছে। খালু সাহেব ধনবান মানুষ ছিলেন। তিনি অনেক টাকা-পয়সা রেখে গিয়েছিলেন। বাবার উদ্দেশ্য ছিল, বড়খালাকে আমাদের বাড়িতে তুলে তাঁর টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেয়া। বাবার এই উদ্দেশ্য সফল হয় নি। বড়খালা বাবার ফাঁদে কখনো পা দেন নি।

বাবা কিছুদিন পর পরই নতুন নতুন ব্যবসার পরামর্শ করতেন বড়খালার সঙ্গে। উৎসাহ এবং উত্তেজনায় তিনি তখন ঝলমল করতেন। বড়খালাও বাবার কথা খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন।

আপা! আপনি যে শুধু সম্পর্কে আমার আপা, তা না। আপনি আমার মুরুব্বি। আজকে আমি এসেছি আপনার দোয়া নিতে। পা-টা একটু আগায়ে দেন। সালাম করি।

বড়খালা পা এগিয়ে দিলেন। বাবা সালাম করলেন। আয়োজন করে সালাম।

নতুন একটা ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছি আপা, আপনার দোয়া চাই। এতদিন যা করলাম, সবই তো টুকটাক। ঢাকের বাদ্য। এইবার গুড়ুম গাড়ুম বজ্রপাত।

কিসের ব্যবসা করবে ?

রঙের ব্যবসা। ডাই। সুতায় যে রঙ দেয়া হয় সেই রঙ। বাংলাদেশে এই ব্যবসা একচেটিয়া যে করত তার নাম নাজিম। চাঁদপুরে বাড়ি। বিয়ে করেছে জামালপুরের মুনশি বাড়ির মেয়ে। সেই সূত্রে আমার সাথে পরিচয়। আমাকে সে খুবই ভালো পায়। দুলাভাই ডাকে।

তোমাকে খামাখা দুলাভাই ডাকে কেন ? তুমি তো আর তার বোনকে বিয়ে কর নাই।

এইখানে একটা মজা আছে। তার যে আসল দুলাভাই, সে লঞ্চডুবিতে মারা গেছে। তাঁর চেহারা ছিল অবিকল আমার মতো। এই জন্যেই সে আমাকে ডাকে দুলাভাই। শুধু যে দুলাভাই ডাকে তা-না, সম্মানও সে-রকমই করে।

ও আচ্ছা।

নাজিম সামনের মাসে আমেরিকা চলে যাচ্ছে। গ্রীন কার্ড না-কি ইয়েলো কার্ড কী যেন পেয়েছে। আমাকে সে ডেকে নিয়ে বলেছে, দুলাভাই, আমার রঙের ব্যবসাটা আপনার হাতে দিয়ে যাই। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। জাপানে এবং কোরিয়ায় এলসি খুলবেন। রঙ আনবেন। ক্যাশ পয়সায় বেচবেন। পার্টি আপনার বাড়িতে এসে টাকা দিয়ে যাবে, আপনাকে যেতেও হবে না। আপা, এখন আপনি বলেন, এই ব্যবসাটা করা উচিত না ?

অবশ্যই উচিত।

একটা জায়গায় শুধু আটকা পড়েছি। ক্যাপিটেলের সমস্যা। পাঁচ লাখ টাকা ক্যাপিটেল লাগে। তিনমাসের মধ্যে অবশ্য ক্যাপিটেল উঠে আসবে। ক্যাপিটেলের বিষয়ে আপনি কি আমাকে কোনো বুদ্ধি দিতে পারেন ?

আমি তোমাকে কী বুদ্ধি দিব ? আমি মেয়েমানুষ, ব্যবসার আমি বুঝি কী ?

একটা বুদ্ধি অবশ্যি আমার মাথায় এসেছে। ক্যাপিটেলটা আমি আপনার কাছ থেকে ধার নিলাম। তিনমাস পর আপনার টাকা আপনাকে ফেরত দিলাম, প্লাস লাভের একটা পারসেনটেজ। আপা, আপনি কী বলেন ? আপনি হলেন ব্যবসার স্লিপিং পার্টনার। কিছুই করতে হচ্ছে না, ঘরে বসে টাকা।

আমি টাকা পাব কই ?

কেন, আপনার টাকা তো আছে!

আমার টাকা কোথায় ? তোমার দুলাভাইয়ের টাকা। উনি কঠিন হুকুম দিয়ে গেছেন, আমি যেন টাকায় হাত না দেই। তার হুকুমের বাইরে যাব কীভাবে ?

মাত্র তিন মাসের ব্যাপার।

তিনদিনের ব্যাপার হলেও তো পারব না। উনার হুকুম।

বাবা রবার্ট ব্রুসের মতো। মচকাবার লোক না। তিনি পেছনে লেগেই থাকেন। নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে বড়খালার কাছে যান। একবার গেলেন বড়খালার মগবাজারের বাড়ির বিষয়ে কথা বলতে। নানান ভণিতার পর বললেন, আপা, আপনার মগবাজারের বাড়িটা এমন এক সুবিধাজনক অবস্থায় আছে যে এটাকে বাড়ি বলা ঠিক না।

বাড়ি না বলে কী বলবে ?

গোল্ড মাইন। সোনার খনি। এখানে একটা রেস্টুরেন্ট দিলে ছয় মাসের মধ্যে...

ছয় মাসের মধ্যে কী ?

ছয় মাসের মধ্যে আপনি কোটিপতি। টাকা গুনতে গুনতে আপনার হাতে ঘা হয়ে যাবে।

হোটেল চালাবে কে ?

আমি চালাব। শেফ আসবে ইন্ডিয়া থেকে। দেখেন না কী করি। রেস্টুরেন্টের একটা নামও ঠিক করেছি। আপনার পছন্দ হয় কি-না দেখেন— 'রসনা বিলাস'।

নাম তো সুন্দর।

তিন ধরনের রান্না হবে, দেশী, মোঘলাই, চাইনিজ। অনেকটা ফুড কোর্টের মতো। আপনি অনুমতি দিলে কাজ শুরু করে দেই। অনেক পেপার ওয়ার্ক আছে।

তোমার দুলাইকে জিজ্ঞেস না করে অনুমতি দেই কীভাবে ?

উনি মৃত মানুষ! উনাকে কীভাবে জিজ্ঞেস করবেন ?

মৃত মানুষকে জিজ্ঞেস করার উপায় আছে। একে বলে ইস্তেখারা। দোয়া দরুদ পড়ে ঘুমাতে হয়। উত্তর-দক্ষিণে পাক পবিত্র হয়ে শুতে হয়। মুখ থাকে কাবার দিকে ফিরানো। দেখি আগামী বৃহস্পতিবার ইস্তেখারা করে দেখি...

বাবা বললেন, উনাকে এইসব জাগতিক বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে বিরক্ত করা ঠিক না। মগবাজারের বাড়িটাকে রেস্টুরেন্ট বানালে উনি খুশিই হবেন। ভাড়াটের কাছ থেকে আর কয় পয়সা আদায় হয় বলেন ? আপনি অনুমতি দেন, ভাড়াটেদের উৎখাত নোটিশ দিয়ে দেই।

তোফাজ্জল শোন, তোমার দুলাভাইয়ের অনুমতি ছাড়া আমি কিছুই করব না। কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর, আমি উনার কাছ থেকে জেনে নেই।

বড়খালার কাছ থেকে ধাক্কা খেয়ে বাবা আমার ঘরে এসে বসেন। তিনি ছোটখাটো মানুষ, ঐ ঘর থেকে বের হবার পর তাঁকে আরো ছোটখাটো দেখায়। ঠাণ্ডা ঘর থেকে হঠাৎ গরম ঘরে ঢোকার কারণে তিনি খুব ঘামতে থাকেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, পানি খাওয়া তো বাবা।

তিনি পানি শেষ করেন এক চুমুকে, তারপর বিড়বিড় করে বলেন, কঠিন মহিলা। অতি কঠিন। মচকাবার জিনিস না।

বড়খালার কথা বলছ ?

হুঁ। তাকে এই বাড়িতে এনে বিরাট ভুল করেছি। সিন্দাবাদ যে ভুল করেছিল সেই ভুল। সিন্দাবাদ কী করেছিল জানিস তো ? এক ভূত ঘাড়ে নিয়েছিল, আর নামাতে পারে না।

বাবা পানি শেষ করে সিগারেট ধরান। সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে উদাস হয়ে যান। তাঁর জন্যে তখন আমার বেশ মায়া লাগে।

আমি ছাড়া বাবার প্রতি আর কেউ মায়া বোধ করে বলে আমি মনে করি না। মায়া বোধ করার কোনো কারণও নেই। বাবা কারো কাছ থেকে তাঁর টাউট প্রকৃতি লুকাতে পারেন না। নিজের ছেলেমেয়ে স্ত্রীর কাছেও না। টাউটদের কেউ পছন্দ করে না।

আজ বৃহস্পতিবার। সকাল নয়টা মাত্র। আমার হাতে বাবার কালো চামড়ার জুতা। পালিশ প্রায় শেষ পর্যায়ে। একটু আগে আমি বড়খালার ঘর থেকে এসেছি। ভূতের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি আবার টিভি দেখা শুরু করেছেন। তাঁর চায়ের ফরমাস এখনো পালন করা হয় নি। তাতে কোনো সমস্যাও নেই। বড়খালার মধ্যে কোনো তাড়াহুড়া নেই। চা যদি তাঁর কাছে দু'ঘণ্টা পরেও যায় তিনি অভিযোগ করবেন না।

দরজা ঠেলে বাবা ঢুকলেন। গরমের মধ্যেও তাঁর পরনে স্যুট। গলায় টাই। কিছুক্ষণ আগে শেভ করেছেন। গাল চকচক করছে।

বাবলু, জুতার খবর কী রে? দেখি।

তিনি সময় নিয়ে জুতা দেখলেন। জুতায় মুখ দেখা যায় কি-না সেই চেষ্টা।

ভালো হয়েছে। ভদ্রলোক চেনা যায় জুতা দিয়ে, এটা জানিস?

না।

মানুষের জুতা দেখে তার স্বভাব, চরিত্র, হাবভাব সব বলে দেয়া যায়। নে এই পাঁচটা টাকা রাখ। দে জুতা পরায়ে দে। অন্যকে জুতা পরায়ে দেয়া খুবই অসম্মানের কাজ। শুধু বাবার পায়ে জুতা পরানো সম্মানের কাজ।

আমি জুতা পরালাম। জুতার ফিতা লাগালাম। বাবা সিগারেট ধরালেন। সিগারেট শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমার সঙ্গে গল্প করবেন। এটা তাঁর নিত্য দিনের রুটিন।

তোর বড়খালা নাকি ভূত দেখা শুরু করেছে?

হুঁ।

দিনেদুপুরেও নাকি দেখে?

হুঁ।

মাথা তো মনে হয় পুরাপুরিই গেছে। তোর কী ধারণা?

কথাবার্তা শুনে সে-রকম মনে হয় না।

কথাবার্তায় কিছুই বোঝা যায় না। বোঝা যায় কর্মে। দিনেদুপুরে যে ভূত দেখে, ভূতের সঙ্গে গল্প করে, সে মানসিকভাবে সুস্থ হয় কীভাবে?

তিনি হয়তো সত্যিই ভূত দেখেন।

তোর কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল? তুই থাকিস তাঁর পাশের ঘরে। উনার রেডিয়েশন তোর উপর আসতে পারে। সব মানুষের রেডিয়েশন আছে, এটা জানিস?

না।

সব মানুষের রেডিয়েশন আছে। কারোরটা ভালো কারোরটা মন্দ। আমি একজন পীর সাহেবের কাছে যাই। উনার রেডিয়েশন মারাত্মক। 'ধাক' টের পাওয়া যায়।

তোমার পীর সাহেব আছে না-কি?

আছেন একজন। তবে আমি উনার মুরিদ না। এম্নি মাঝে-মধ্যে যাই। আমাকে স্নেহ করেন। তোকে নিয়ে যাব একদিন। কিছুক্ষণ কথা বললেই উনার পাওয়ার বুঝবি। উনি থাকেন হাঁটার মধ্যে। দিনরাত হাঁটেন। তাঁর পেছনে পেছনে ভক্তরা হাঁটে। মজ্জুম অবস্থা।

মজ্জুম অবস্থা কী?

সাধনার স্তর। শেষ স্তরের নাম ফানা ফিল্লাহ। সেটা কঠিন জিনিস। আল্লাহ পাকের সঙ্গে ডাইরেক্ট কানেকশন।

বাবার সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। তিনি এখনো উঠছেন না। মনে হয় তিনি আরো কিছুক্ষণ কথা বলবেন।

তোর বড়খালার ব্রেইন যদি সত্যি সত্যি আউট হয়ে যায় তাহলে তো বিরাট সমস্যা। তাঁর টাকা-পয়সার বিলি ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা। টাকা পাবে কে?

উনার ছেলে জহির ভাই পাবেন।

বোকার মতো কথা বলিস না বাবলু। বোকা যখন বোকার মতো কথা বলে তখন শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু একজন বুদ্ধিমান ছেলে যদি বোকার মতো কথা বলে তখন শুনতে ভালো লাগে না। জহির উনার টাকা-পয়সা থেকে একটা পাঁচ টাকার নোটও পাবে না।

কেন পাবে না?

আরে গাধা, জহির তো তাদের ছেলে না। পালক পুত্র। এখন বুঝেছিস? 'পালক পুত্র পুত্র নহে'— এই কথা কোরান শরীফেও আছে। তোর খালার বিষয়-সম্পত্তির মালিক আসলে আমরা।

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। প্রথম যখন আমার ঘরে ঢুকেছিলেন তখন তাঁর চেহারায় একটা ক্লান্ত ভাব ছিল। এখন সেই ক্লান্তি নেই। বাবার চোখ তাঁর জুতার মতোই চকচক করছে।

বাবলু!

জি বাবা ?

তোর বড়খালার সঙ্গে একটু 'হাই হ্যালো' করে যাই। তাঁকে খুশি রাখা আমাদের কর্তব্য। মহিলার কাপড়চোপড় ঠিক আছে কি-না কে জানে! নেংটা মেংটা বসে থাকে— এক দিগদারি।

বাবা খালার ঘরে ঢুকলেন, আমি দোতলা থেকে একতলায় নামলাম। বড়খালার চায়ের অর্ডার দেব। নিজে চা খাব। নাশতা তৈরি হয়ে থাকলে নাশতা খাব। এই বাড়িতে দু'ধরনের নাশতা হয়। একদিন হয় পাতলা খিচুড়ি বেগুন ভাজা। আরেকদিন হয় আটার রুটি আলু ভাজা। শুধু আমার নীলা ফুপুর জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। নীলা ফুপু পাতলা খিচুড়ি খেতে পারেন না। তার ধারণা, পাতলা খিচুড়ি ফকির-মিসকিনদের খাবার। যারা দিনের পর দিন পাতলা খিচুড়ি খায় তারা ভবিষ্যতে ফকির-মিসকিন হয়। তিনি আটার রুটিও খেতে পারেন না। শুকনা রুটি তার নাকি গলায় আটকে যায়।

নীলা ফুপু সকালবেলা দুধ দিয়ে এক বাটি কর্নফ্লেক্স খান, অর্ধেকটা কলা খান। বাকি অর্ধেক কলা চটকে (খোসাসুদ্ধ) তিনি একটা মিকচারের মতো বানান। এই মিকচার চোখ বন্ধ করে চোখের ওপর দিয়ে রাখেন। তার দুই চোখের নিচেই কালো ছোপ পড়েছে। কলার মিকচার চোখের নিচের কালো দাগ দূর করার মহৌষধ।

নীলা ফুপু দেখতে খারাপ না। মায়া মায়া চেহারা। লম্বা চুল, বড় বড় চোখ। গায়ের রঙ দুধে-আলতা না হলেও ভালো। তাঁর একটাই সমস্যা। তিনি বেঁটে। ঢাকা শহরের সবচে' বড় হিলের জুতা তিনি পরেন। তারপরেও তাঁকে বেঁটে লাগে। লম্বা হবার অনেক চেষ্টা তিনি করেছেন। হাইটোলিন নামের একটা পেটেন্ট ওষুধ তিনি দুই বছর খেয়েছেন। এই ওষুধ খেলে প্রতি বছরে এক পয়েন্ট পাঁচ সেন্টিমিটার করে লম্বা হবার কথা। তিনি লম্বা হন নি, বরং শরীর ফুলে গেছে। ওষুধ খাওয়ার জন্যেই হয়তো তার খুকি খুকি চেহারা এখন বদলে মহিলা মহিলা চেহারা হয়ে গেছে।

লম্বা হবার আশা নীলা ফুপু এখনো ছাড়েন নি। তাঁর ঘরে কোনো ফ্যান নেই। ফ্যানের জায়গায় নাইলনের দড়ি দিয়ে রিং ঝুলানো। প্রতিদিন তিনি ঘড়ি

ধরে পনেরো মিনিট রিং-এ ঝুলেন। প্রচণ্ড গরমেও তিনি ফ্যান ছাড়া ঘুমান। কারণ ফ্যানের বাতাসে ঘুমালে নাকি শরীর ভ্যাবসা হয়ে যায়।

শরীর ভ্যাবসা হয়ে গেলে নীলা ফুপুর বিরাট সমস্যা হবে। এখন তার কাছে শরীর, চেহারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি একটা মেগাসিরিয়ালে চান্স পেয়েছেন। সিরিয়ালের নাম 'কুসুম কানন'। নায়িকার নাম কুসুম। নায়কের নাম কানন। দু'জনের নাম দিয়ে সিরিয়ালের নাম। কাহিনী খুব ট্রাজিক। নায়িকা অ্যাকসিডেন্ট করে অন্ধ হয়ে যায়। নায়ক তার একটা চোখ দান করে নায়িকার একটা চোখ রক্ষা করে। তারপর আবার দুজনই কী করে যেন অন্ধ হয়ে যায়। শেষে একজন বিদেশী ডাক্তার অপারেশন করে দুজনকেই ঠিক করে দেন। সিরিয়ালে নীলা ফুপুর রোল খুবই ছোট। নায়কের বাড়ির সে সহকারী (আসলে কাজের মেয়ে। কাজের মেয়ের রোলে অভিনয় করছেন বলতে নীলা ফুপুর লজ্জা লাগে বলেই তিনি সবাইকে বলেন, সহকারীর ক্যারেক্টার।) রোল ছোট হলেও অনেক কিছুই না-কি করার আছে। সিরিয়ালের পরিচালক মুকুল সাহেব নীলা ফুপুকে বলেছেন— শেষের দিকে এসে এই ক্যারেক্টারে অনেক টার্ন আছে।

নীলা ফুপু কয়েক বছর ধরেই ইন্টারেমিডিয়েট পড়ছেন— কমার্স। প্রথমবার পাশ করতে পারেন নি। পরের বার সিরিয়ালের কারণে পরীক্ষা দিতে পারেন নি। এবারো মনে হয় দিতে পারবেন না। তবে পড়াশোনা নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। কেউ যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করে, কী পড় ? তিনি হাসিমুখে বলেন, ইন্টার পড়ি। আমার ধারণা, ফুপু যতদিন বাঁচবেন, ইন্টার পড়ি বলেই কাটিয়ে দিবেন।

আমি রান্নাঘরে ঢুকে বড়খালাকে চা পাঠাতে বললাম। খাবার টেবিলে নীলা ফুপুর পাশে এসে বসলাম। টেবিলের মাঝখানে বল ভর্তি পাতলা পানি পানি খিচুড়ি। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বলে দুধের মতো সর পড়েছে। আমি খিচুড়ি নিতে যাচ্ছি, নীলা ফুপু বললেন, খিচুড়ি নিস না। আজকের খিচুড়িতে প্রবলেম আছে।

কী প্রবলেম ?

খিচুড়িতে একটা তেলাপোকা পাওয়া গেছে।

আমি হাত গুটিয়ে বসলাম। খিচুড়িতে তেলাপোকা পাওয়া আমাদের বাসার একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এটা নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না। হাঁড়ির যে অংশে তেলাপোকা পাওয়া গেছে, মা সেখান থেকে তেলাপোকা সুদ্ধ এক খাবলা খিচুড়ি শুধু ফেলে দেবেন। তারপর সূরা এখলাস পড়ে ফুঁ দিবেন। সূরা এখলাস

পড়ে ফুঁ দিলে খাবার শুদ্ধ হয়ে যায়। মা না-কি কোনো এক ধর্মের বইয়ে পড়েছেন।

নীলা ফুপু বললেন, তোকে টাকা দিচ্ছি, তুই হোটেল থেকে গোশত পরোটা খেয়ে আয়।

আমি বললাম, ইন রিটার্ন তোমার জন্যে কী করতে হবে সেটা বলো।

কিছুই করতে হবে না। দশ টাকায় তোর নাশতা হবে না?

হবে।

বসে থাক, আমি খাওয়া শেষ করে তোকে টাকা এনে দিচ্ছি।

নীলা ফুপু অকারণে টাকা খরচ করার মেয়ে না। আমাকে নাশতা খাওয়ানোর জন্যে তাঁর কোনো ব্যাকুলতা থাকার কথাও না। রহস্য কিছু আছে। আমি সেই রহস্যের অপেক্ষা করছি।

বাবলু, এই নে তোর নাশতার টাকা। আর এই খামটা নে। জরুরি একটা চিঠি আছে, মুকুল ভাইয়ের হাতে দিবি। পারবি না?

পারব।

মুকুল ভাই কিন্তু এগারোটার পর বাসায় থাকেন না। এগারোটার মধ্যে যাবি। আর শোন, চিঠিটা খুবই জরুরি। অন্য কারো হাতে যেন না পড়ে।

চিঠিতে কী লেখা?

আছে কিছু ব্যক্তিগত বিষয়। তুই বুঝবি না।

নাশতা খেতে খেতে আমি ফুপুর চিঠি খুলে ফেললাম। অনেক কায়দা করতে হলো। চায়ের গরম কাপের সঙ্গে খামের মুখ চেপে ধরা। ব্লেড দিয়ে ঘষা। তারপরেও সমস্যা হলো— খামের মুখ সামান্য ছিঁড়ে গেল। এবং খামের গায়ে মাংসের ঝোল লেগে গেল।

এত ঝামেলা করে উদ্ধার করা নীলা ফুপুর চিঠিটা এরকম—

মুকুল ভাই,

আপনি কি ঐ দিনের ঘটনা কাউকে বলেছেন? অবশ্যই বলেছেন। না বললে রিয়া কী করে এমন একটা কথা বলল? রাগে-দুঃখে আমি অনেকক্ষণ কেঁদেছি। আমি অনেকবার মোবাইলে আপনাকে ধরার চেষ্টা করেছি। রিং হয়, কিন্তু আপনি ধরেন না। আমার ধারণা আমার নাম্বার দেখেই আপনি ধরেন না।

এখন রিয়া আমাকে কী বলেছে সেটা শুনুন। রিয়া টেলিফোন করে বলল, সোমবার শুটিং শেষ করে তুই গুলশানের কোনো রেস্ট হাউসে গিয়েছিলি? আমি বললাম, রেস্ট হাউসে কেন যাব? আমি বাসায় চলে এসেছি। তখন রিয়া বলল, আচ্ছা শোন, তোর কি সবুজ রঙ খুব পছন্দ? আমি বললাম, কী আবোল-তাবোল কথা বলছিস! সবুজ রঙের কথা আসল কেন? তখন রিয়া বলল, না, তোর আন্ডার গার্মেন্টসের কালার সবুজ— এই জন্যই রঙের কথা আসল।

আচ্ছা মুকুল ভাই, আমার আন্ডার গার্মেন্টসের কালার রিয়া কীভাবে জানল? আপনি কি সবাইকে সবকিছু বলে দিচ্ছেন?

চিঠিতে আমি সব কথা বলতে পারছি না। আপনাকে আমার আরো কথা বলার আছে। দয়া করে আমি যখন টেলিফোন করব তখন টেলিফোন ধরবেন। আপনি আমাকে আপনার বাসায় যেতে নিষেধ করেছেন বলে আমি যাই না। নিষেধ না করলে সরাসরি আপনার বাসায় চলে যেতাম।

মুকুল ভাই, আমাদের Next Lot-এর শুটিংয়ের ডেট কি হয়েছে? আমাকে কেউ কিছু জানায় না। এই লটে আপনি কি আমার ক্যারেক্টারটার দিকে একটু নজর দিবেন? গত এপিসোডে আমি শুধু একবার গ্লাসে দুধ নিয়ে ঢুকেছি। কোনো ডায়ালগ নাই। ডায়ালগ না থাকলে অভিনয়টা করব কীভাবে?

মুকুল ভাই, আপনি আমার ওপরে রাগ করবেন না। যদি উল্টাপাল্টা কিছু বলে থাকি তার জন্যে ক্ষমা করবেন।

ইতি
আপনার স্নেহধন্যা
নীলা

মুকুল ভাই বিশাল এক ইজিচেয়ারে কাত হয়ে আছেন। তাঁর মাথার নিচে বালিশ। ইজিচেয়ারের হাতলে একটা গ্লাসে খুব সম্ভব অরেঞ্জ জুস। মাছি ভনভন করছে। মুকুল ভাইকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি রাতে ঘুমান নি। চোখ লাল।

চোখের নিচে কালি। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তাঁর চেহারা পরিচিত কোনো মহাপুরুষের মতো। এখন নামটা মাথায় আসছে না। পরে নিশ্চয়ই আসবে।

তিনি হাই তুলতে তুলতে নীলা ফুপুর চিঠি পড়লেন। হাই তুলতে তুলতে বললেন, খামটা কি আগে খোলা হয়েছে ?

আমি বললাম, খোলা হয়েছে কি-না জানি না। আমাকে যেমন দিয়েছে আমি নিয়ে এসেছি।

নীলা তোমার কে হয় ?

ফুপু।

আপন ?

জি।

ভেরি গুড। একটা কাজ করে দাও। ঘরে কোনো লোকজন নেই, এক প্যাকেট সিগারেট এনে দাও। বেনসন। দেশীটা আনবে। সত্তুর টাকা প্যাকেট নিবে। সঙ্গে একটা ম্যাচ আনবে। পারবে না ?

জি পারব।

মুকুল ভাই মানিব্যাগ হাতাহাতি করতে লাগলেন। একশ' টাকার নোট খুঁজছেন। মানিব্যাগে একশ' টাকার নোট নেই, সবই পাঁচশ' টাকার নোট। মনে হয় তিনি আমাকে পাঁচশ' টাকার নোট দিতে ভরসা পাচ্ছেন না।

তোমার নাম যেন কী ?

বাবলু।

পাঁচশ' টাকার একটা নোট দিলাম। দুই প্যাকেট সিগারেট আর দুইটা ম্যাচ আনবে। দেরি করবে না। যাবে আর আসবে। সকাল থেকে সিগারেট খাই নি। ফুসফুস জ্যাম হয়ে আছে।

আমি পাঁচশ' টাকার নোট নিয়ে বাসায় চলে এলাম। একটু ভুল বললাম, বাসায় না, বাসার সামনেই ভিডিও'র দোকান 'দি ইমেজে' চলে এলাম। জহির ভাই বেশির ভাগ সময় এই দোকানেই বসে থাকেন। দোকানের মালিক ফারুক ভাই উনার জানি দোস্ত। দোকানে একটা পার্টিশান আছে। পার্টিশানের ওপাশে বড় ডিভান পাতা আছে। জহির ভাই এই ডিভানে শুয়ে ঘুমান কিংবা ম্যাগাজিনের ছবি দেখেন। যে-কোনো ম্যাগাজিনের নায়ক-নায়িকার ছবির দিকে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতে পারেন।

জহির ভাই ডিভানে পা ঝুলিয়ে বসে ছিলেন। কিছুক্ষণ আগে তার ঘুম ভেঙেছে। চোখে-মুখে এখনো ঘুম লেগে আছে। তাঁর কানের ওপর একটা

সিনেমা ম্যাগাজিন। একহাতে সিগারেট অন্য হাতে ম্যাচ। সিগারেট এখনো ধরানো হয় নি। ঘুম কাটলেই সিগারেট ধরাবেন। জহির ভাই আমার দিকে তাকিয়ে হাই তুললেন। আমি বললাম, নাশতা করেছ ?

জহির ভাই বিরক্ত গলায় বললেন, না।

চল নাশতা করে আসি।

টাকা আছে ?

হুঁ।

কত ?

পাঁচশ' পনের।

জহির ভাই আবারো হাই তুললেন। সিগারেট ধরালেন। বিরক্ত ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, আমার সন্ধ্যার মধ্যে দুই হাজার টাকা দরকার। মা'কে বলে টাকা জোগাড় করে দে।

আমি চাইলে দিবে না। তুমি চেষ্টা করে দেখ।

আমাকেও দিবে না। তোর নীলা ফুপুর কাছে আছে ? নাটক-ফাটক করে যখন টাকা থাকার তো কথা।

থাকতে পারে।

চেষ্টা করে দেখবি ?

চেষ্টা করতে পারি। এই পাঁচশ' রাখ।

খুচরা-খাচরা নিয়ে লাভ নাই। পুরা দুই হাজার জোগাড় করতে পারলে দিবি, না পারলে নাই। ফ্লাক্স নিয়ে যা, আমার জন্যে চা নিয়ে আয়।

বাসার চা, না দোকানের চা ?

মজিদের দোকানের চা। মজিদকে বলবি যেন স্পেশাল করে বানায়।

জহির ভাই শুয়ে পড়লেন। ম্যাগাজিন খুলে বুকের ওপর ধরলেন। তাঁর দুই হাতে ম্যাগাজিন ধরা, ঠোঁটে সিগারেট। তিনি হাত দিয়ে সিগারেট ধরছেন না। মাঝে-মাঝে মাথা ঝাঁকি দিচ্ছেন সিগারেটের ছাই ফেলার জন্যে। ছাই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি নির্বিকার।

আমি জহির ভাইকে খুবই পছন্দ করি। কেন করি নিজেও জানি না। পছন্দ করার মতো তেমন কোনো গুণ তাঁর নেই। অপছন্দ করার মতো অনেক কিছুই আছে। কোনো মানুষই সারাক্ষণ মেজাজ খারাপ করে থাকতে পারে না। জহির ভাই পারেন। কেউই ময়লা কাপড় পরতে পছন্দ করে না, জহির ভাই করেন।

তাঁর সার্বক্ষণিক পোশাক স্যান্ডেল, জিনসের প্যান্ট এবং হলুদ শার্ট। শার্টে ময়লা জমতে জমতে ছাতা পড়ে গেছে। হলুদ শার্ট এখন আর হলুদ না— কালচে সবুজ।

সমস্যা হচ্ছে, সেই নোংরা কাপড়েও তাঁকে মানায়। তাঁর চেহারা রাজপুত্রের মতো। ময়লা জামা-কাপড়ে তিনি যখন বের হন তখন মনে হয় ছবির শুটিং হচ্ছে। ছবির নায়ক ভ্যাগাবণ্ড সেজে অ্যাকটিং করছে। জহির ভাইকে নিয়ে একটা মজার গল্প বললে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হবে। তিনি আর আমি মোহাম্মদপুর বাজারে গিয়েছি। মাসের বাজার করা হবে। চাল, ডাল, তেল এইসব কেনা হবে। জহির ভাইয়ের মেজাজ খুবই খারাপ। তিনি বললেন, বাজার সদাই যা করার তুই করতে থাক। আমি এর মধ্যে নেই। আমি এখানে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সিগারেট খেতে থাকব। বাজার শেষ হলে আমাকে নিয়ে যাবি। বাজারের টাকা থেকে আমাকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিয়ে যা।

জহির ভাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই এক লোক এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। থলথলে ভুঁড়িওয়ালা এক লোক। এক হাতে চারটা মুরগি, অন্যহাতে বাজারের থলে। লোকটার পেছনে এক মিস্তি। মিস্তির মাথায় ঝাঁকা ভর্তি কাঁচা বাজার। লোকটা জহির ভাইয়ের দিকে এগিয়ে এসে পরিচিত ভঙ্গিতে বলল, ভালো আছেন ?

জহির ভাই জবাব দিলেন না। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। লোকটা বলল, আমার নাম আজিজুর রহমান খোকন। আমি চিত্রপরিচালক। দূর থেকে আপনাকে দেখে ভালো লেগেছে। আপনি কী করেন ?

থুথু ফেলতে ফেলতে জহির ভাই বললেন, কিছু করি না।

ছবি করবেন ?

রোল কী ?

নায়কের বন্ধু।

জহির ভাই বললেন, আমাকে নায়কের বন্ধু করলে আপনার নায়ক মার খাবে। সেটা কি ঠিক হবে ?

আজিজুর রহমান খোকন সাহেব বললেন, হাটে বাজারে তো এইসব আলাপ চলে না, আপনি একদিন অফিসে আসুন। আমার অফিস কাকরাইলে। সিনেমা পাড়ায়।

জহির ভাই বললেন, আমি অফিসে যাই না।

খোকন সাহেব বললেন, মোবাইল নাম্বার দেন আমি যোগাযোগ করব।

জহির ভাই বললেন, মোবাইল নাই। আচ্ছা শুনুন, আপনি তো ভালো বাজার করেন। মুরগি ভালো কিনেছেন। দুইটা মুরগি আমাদের দিয়ে যান। এতগুলো দিয়ে কী করবেন ?

আজিজুর রহমান খোকন সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। জহির ভাই আমার দিকে তাকিয়ে নির্বিকার গলায় বললেন, বাবলু, উনার কাছ থেকে দুইটা মুরগি রেখে দে।

খোকন সাহেব বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। জহির ভাই হাই তুলতে তুলতে বললেন, দুটা দিতে না চাইলে একটা দেন। সাদা গলার মুরগিটা দেন।

জোকারি কথাবার্তা বললেও জহির ভাই কিন্তু জোকার না। সিরিয়াস টাইপ মানুষ। খোকন সাহেবের কাছে সে যে মুরগি চেয়েছে জোকারি করে চায় নি, সত্যি সত্যি চেয়েছে।

জহির ভাইয়ের দুই হাজার টাকা সন্ধ্যার মধ্যে দরকার। অবশ্যই জরুরি কোনো কাজে দরকার। জরুরি কাজটা কী কে জানে ? পনেরশ' টাকার জন্যে আমি কার কার কাছে যাব তার লিস্ট করে ফেললাম। প্রথমে নীলা ফুপু, তারপর বড়খালা, তারপর মা, সবশেষে ভাইয়া।

নীলা ফুপু আমাকে দেখে প্রায় ছুটে এলেন। চোখ-মুখ শুকনা করে বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলি ? একটা চিঠি মগবাজারে দিয়ে আসতে একঘণ্টা ছাব্বিশ মিনিট লাগে ? মুকুল ভাইকে পেয়েছিলি ?

হুঁ।

চিঠি তাঁর হাতে দিয়েছিস ?

হুঁ।

চিঠি পড়েছেন ?

হুঁ।

তোর সামনেই পড়ছেন ?

হুঁ।

সব কথাতেই হুঁ হুঁ করছিস কেন ? কথা বলা ভুলে গেছিস ? চিঠি পড়ার পর মুকুল ভাই কিছু বলেছেন ?

আমাকে বললেন, এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিতে পারবে ?

শুধু এইটুকু বলেছেন। আর কিছু বলেন নি ?

না।

সিগারেট কিনে দিয়ে এসেছিস তো ?

হুঁ।

উফ, লোকটা এত সিগারেট খায়! সারা শরীরে সিগারেটের গন্ধ।

আমি কিছুক্ষণ নীলা ফুপুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমাকে পনেরশ' টাকা ধার দিতে পারবে ?

কী করবি ?

আমি একজনকে দেব। আমার কাছে চেয়েছে।

সেই একজনটা কে ?

জহির ভাই।

আমার কাছে টাকা নেই।

টাকা নেই, তাহলে এত কথা জিজ্ঞেস করলে কেন ? টাকা দিয়ে কী করবি ? কাকে ধার দিবি ?

জানার জন্যে জিজ্ঞেস করেছি। যা এখন ভাগ। সেদিনের ছেলে, চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শিখেছে!

আমি নীলা ফুপুর সামনে থেকে বের হলাম। বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সিক্সথ সেন্স আমাকে বলছে টাকা পাওয়া যাবে না। যার কাছে যাব সে-ই বলবে 'না'। মাঝে মাঝে আমার সিক্সথ সেন্স খুব কাজ করে।

বাবলু, একটু শুনে যা তো।

আমি তাকিয়ে দেখি ভাইয়া তাঁর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। ঘরের দরজা খোলা। খুবই অস্বাভাবিক দৃশ্য, ভাইয়ার ঘরের দরজা কখনো খোলা থাকে না।

একতলার সবচে' শেষের ঘরটা ভাইয়ার। ঘরটা ছোট। ঘরের একটাই জানালা, সেই জানালাটাও ছোট। জানালা ঘেঁসে বিশাল একটা পেয়ারা গাছ উঠেছে। গাছে এখন পর্যন্ত কোনো পেয়ারা হয় নি। এই গাছটা নাকি পুরুষ। পুরুষ পেয়ারা গাছের কারণে ভাইয়ার ঘরের জানালা দিয়ে কোনো আলো ঢুকে না। এটাই ভাইয়ার পছন্দ। তাঁর ঘর অন্ধকার থাকতে হবে। তাঁর ঘরে কেউ ঢুকতে পারবে না। ঘর ঝাঁট দেয়ার জন্যেও না। ভাইয়া তাঁর নিজের ঘর নিজে গোছায়। যে-কেউ ভাইয়াকে দেখলেই বুঝবে সে একজন অস্বাভাবিক মানুষ।

অস্বাভাবিক তো বটেই। এসএসসি পরীক্ষায় ভাইয়া ঢাকা বোর্ডের সব ছেলেমেয়ের মধ্যে থার্ড হয়েছিল। ইন্টারমিডিয়েটে হয়েছে ফোর্থ। ফিজিক্স

অনার্স পরীক্ষায় ফার্স্টক্লাস সেকেন্ড। এমএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। এখনো রেজাল্ট হয় নি। উড়া উড়া শুনতে পাচ্ছি, রেজাল্ট হবার আগেই ভাইয়া পিএইচডি করতে আমেরিকা যাবে। এই বিষয়ে ভাইয়ার কাছ থেকে কিছু শুনি নি। ভাইয়া তাঁর নিজের বিষয়ে কখনো কাউকে কিছু বলে না।

বাবলু বোস, খাটের ওপর বোস।

আমি বসলাম। ভাইয়া আমার সামনে চেয়ারে বসল।

লজেন্স খাবি ? হরলিক্সের কৌটায় লজেন্স আছে। নিয়ে খা। আমাকেও একটা দে।

আমি লজেন্স নিলাম। ভাইয়াকে একটা দিলাম।

রাত জেগে পড়ি তো, তখন ব্রেইন প্রচুর সুগার খরচ করে। শরীরে সুগারের ঘাটতি পড়ে। তখন লজেন্স খাই।

আমি লজেন্স চুষছি। ইচ্ছা করছে লজেন্সটা দাঁত দিয়ে ভেঙে গুঁড়া করে ফেলতে। কড়মড় শব্দ হবে। ভাইয়া হয়তো বা বিরক্ত হবে, এই ভয়ে পারছি না।

বাবলু।

হুঁ।

শরীরের রক্তের তিন ভাগের এক ভাগ যে ব্রেইন নিয়ে নেয়, এটা জানিস ?

না।

ব্রেইনেরই অক্সিজেন সবচে' বেশি দরকার।

ও।

আমার কাছে একটা বই আছে, নাম বোকাওয়ার্স ব্রেইন। পড়ে দেখতে পারিস। মজা পাবি।

ইংরেজি পড়তে পারি না ভাইয়া।

ইংরেজি পড়তে না পারার কী আছে ? একটা ডিকশনারি নিয়ে বসবি। অজানা শব্দগুলির মানে ডিকশনারিতে দেখে নিবি। ভোকাবলারি বাড়বে।

আচ্ছা।

এখন তোর খবর কী বল ?

আমি হুট করে বলে ফেললাম, আমাকে পনেরশ' টাকা দিতে পারবে ভাইয়া।

কত ?

পনেরশ'।

তোষকের নিচে আমার মানিব্যাগ আছে। মানিব্যাগ থেকে নিয়ে নে।

আমি মানিব্যাগ থেকে টাকা নিলাম। হরলিক্সের কৌটা থেকে আরেকটা লজেন্স নিলাম। এই লজেন্স কড়মড় করে ভেঙে খাব। ভাইয়া বিরক্ত হলে হবে।

বাবলু, তোকে একটা কথা বলার জন্যে ডেকেছি। তোর সঙ্গে তো বাবার খুব খাতির। বাবা যে আরেকটা বিয়ে করেছে এটা জানিস ? বাবা তোকে কিছু বলেছে ?

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, না!

বিয়ে করেছে চার বছর আগে। ঐপক্ষে তাঁর একটা মেয়েও আছে। মেয়ের নাম যূথী।

আমি কড়মড় করে লজেন্স ভাঙলাম। ভাইয়ার মুখ দেখে মনে হলো না লজেন্স ভাঙার শব্দ তাঁর কানে গেছে।

ঘটনাটা আমি জানি আর মা জানে। বাবা আর ঐ মেয়ে একটা ওয়ান বেডরুম অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। তোকে ঠিকানা দিচ্ছি, তুই ভেরিফাই করে আসবি।

এখন যাব ?

না, এখন না। একটু রাত করে যা।

ভাইয়ার ঘর থেকে বের হয়ে দেখি মা বারান্দায় মোড়ার ওপর বসেছেন। মাথাটা উঠানের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। নতুন একটা কাজের মেয়ে মা'র মাথায় পানি ঢালছে। এটা নতুন কোনো দৃশ্য না। প্রায়ই মা'র মাথা গরম হয়ে যায়, তখন তাঁর মাথায় পানি ঢালতে হয়। কাজের মেয়েটিকে দেখে মনে হলো, পানি ঢালার কাজটায় সে খুব আনন্দ পাচ্ছে। একহাতে জগে করে পানি ঢালছে অন্যহাতে মাথায় থাবড়া দিচ্ছে। থাবড়া দেয়ার সময় তার মুখ হাসি হাসি হয়ে যাচ্ছে।

মা আমাকে দেখেছেন। তিনি হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। বাবা বিষয়ে কোনো কথা বলবেন কি-না বুঝতে পারছি না। কাজের মেয়ের সামনে বলার কথা না— তবে উচিত অনুচিত নিয়ে মাথা ঘামানোর মানুষ তিনি না। আমি কাছে গেলাম। মা ভাঙা গলায় (মা'র গলা কখনো ভাঙে না, তবে যে-কোনো সময়ে তিনি দুঃখের কথা ভাঙা গলায় বলতে পারেন। আমার সঙ্গে ভাঙা গলায় কথা বলে তার পরপরই অন্য একজনের সঙ্গে স্বাভাবিক গলায় কথা বলবেন। এটা তাঁর কাছে কোনো ব্যাপারই না।) বললেন, খোকনের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছিস ?

হুঁ।

আমার স্যান্ডেলটা সাথে করে নিয়ে যা। যদি দেখিস ঘটনা সত্যি, আমার স্যান্ডেলটা দিয়ে তোর বাপকে দশটা বাড়ি দিবি। পারবি না ? অবশ্যই আমার স্যান্ডেল নিয়ে যাবি। স্যান্ডেল না নিয়ে গেলে তুই আমার কু পুত্র। তোকে আমি পেটে ধরি নাই। অন্য কোনো 'মাগি' তোকে পেটে ধরেছে।...

মা হড়বড় করে কথা বলেই যাচ্ছেন। তাঁর ভাঙা গলা ঠিক হয়ে গেছে। কাজের মেয়েটা মা'র কথা শুনেও মজা পাচ্ছে। সে মুখ আড়াল করে হাসার চেষ্টা করছে। তার হাসির শব্দ মা'র কানে গেলে বিপদ আছে। মা কাজের মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে খুব পছন্দ করেন।

জহির ভাইকে দুই হাজার টাকা দিয়েছি। তিনি টাকা হাতে নেন নি। বিরক্ত মুখে বলেছেন, ম্যাগাজিনটার নিচে রেখে দে। টাকা দিয়েছে কে ?

ভাইয়া।

সাতদিনের মধ্যেই টাকা ফেরত দিব। তখন মনে করে যার টাকা তাকে দিয়ে দিবি।

আচ্ছা।

জহির ভাই বসে আছেন আমার ঘরে। আমার ঘর বলা ঠিক হচ্ছে না, আমাদের ঘর বলা উচিত। জহির ভাই আমার সঙ্গে থাকেন। এই ঘরে দুটো সিঙ্গেল খাট পাতা। তবে এখানে তিনি থাকেন না বললেই হয়। তাঁর স্থায়ী ঠিকানা এখন 'দি ইমেজ'।

বাবলু !

কী জহির ভাই।

এই দুই হাজার নিয়ে আমার কাছে এখন টোটাল ক্যাশ টাকা কত আছে জানিস ?

না।

আন্দাজ কর।

পাঁচ হাজার ?

পঁয়তাল্লিশ হাজার।

এত টাকা ?

পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা বাংলাদেশে এখন কোনো টাকাই না। সদরঘাটে ভিক্ষা করে যে ফকির তাঁর কোচড়েও এই টাকা থাকে। একটা জার্মান লুগার

পিস্তলের দাম সত্তুর হাজারের ওপরে। চাইনিজ পিস্তলের দাম ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার।

তুমি কি পিস্তল কিনবে ?

জহির ভাই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সিগারেট ধরালেন। এখন তাঁর চোখে মুখে বিরক্তি নেই। তাঁকে আনন্দিতই মনে হচ্ছে।

বাবলু !

জি জহির ভাই।

তোর এখানে রাতে ঘুমাই না কেন বল তো ?

জানি না।

অনুমান কর।

ঘরটা ছোট, সিলিং ফ্যানে শব্দ হয়। শব্দে তুমি ঘুমাতে পার না।

হয় নি। তোর ওপরে আমার 'আছর' হোক, এটা চাই না বলেই তোর সঙ্গে ঘুমাই না। ঘুমের সময় আত্মা ফ্রি হয়ে যায়। একজনের আত্মার সঙ্গে আরেকজনের মিলমিশ বেশি হয়। আছরও বেশি পড়ে। তুই যদি সাতদিন কোনো ক্রিমিন্যালের সঙ্গে ঘুমাস, অষ্টম দিনে তুই নিজেও ক্রিমিন্যাল হয়ে যাবি।

তুমি কি ক্রিমিন্যাল ?

এখনো জানি না। পিস্তল হাতে আসুক, তারপর বুঝব।

মানুষ মারবে ?

হুঁ।

কাকে মারবে ?

জহির ভাই হাই তুলতে তুলতে বললেন, প্রথম ধরা খাবে দি ইমেজের মালিক— আমার প্রাণপ্রিয় দোস্ত, ফারুক ভাইজান।

উনি কী করেছেন ?

উনি কী করেছেন তোর জানার দরকার নাই। এই জগতের নিয়ম যত কম জানবি তত সুখে থাকবি। পিঁপড়া সবচে' কম জানে বলে সে মহাসুখে আছে। খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পিঁপড়ার চেয়ে একটু বেশি জানে উইপোকা। উইপোকাকে কী করতে হয় ? আগুন দেখলেই তাকে উড়ে আগুনের কাছে যেতে হয়। উইপোকা যদি কম জানতো তাহলে তাকে আগুনে পুড়ে মরতে হতো না। বুঝতে পারছিস ?

পারছি।

পনের মিনিট ঘুমাব, বুঝতে পারছিস ?

পারছি।

ঘড়ি হাতে নিয়ে বসে থাক। ঠিক পনের মিনিট পরে আমাকে ডেকে তুলবি। তোর ঘড়ি আছে না ?

না।

ঠিক আছে তোকে একটা দামি ঘড়ি দেব। আপাতত আমার ঘড়ি হাতে বসে থাক। ঠিক পনের মিনিট পরে ডাকবি। পনের মিনিটের জায়গায় যদি ষোল মিনিট হয়, কনুইয়ের গুতা খাবি। জায়গা মতো কনুইয়ের গুতা দিলে যে মানুষ মরে যায়, এটা জানিস ?

না।

মানুষের শরীরে কয়েকটা দুর্বল জায়গা আছে, সেখানে গুতা লাগলে শেষ। কলমা পড়ার সুযোগও পাবে না।

জহির ভাই তাঁর হাতঘড়ি খুলে আমার হাতে দিলেন। বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করে বললেন, আমি কাউন্টিং শুরু করতে বললেই কাউন্টিং শুরু করবি।

আচ্ছা।

মা না-কি আজকাল ভূত-প্রেত দেখা শুরু করেছে, এটা সত্যি ?

হুঁ।

মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ভালো ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করানো দরকার।

সত্যিও তো হতে পারে।

হতে পারে। There are many things in heaven and earth... কার কথা বল দেখি ?

শেক্সপিয়ারের।

জানলি কী ভাবে ?

তুমি আগে একবার বলেছিলে—

ভেরি গুড। হ্যামলেটে আছে। Ok, start counting.

জহির ভাই পাশ ফিরলেন। আমি তাকিয়ে আছি ঘড়ির দিকে। জহির ভাই বিষয়ে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি— জহির ভাইও খুব ভালো ছাত্র। ভাইয়ার মতো না হলেও বেশ ভালো। এসএসসি, ইন্টারমিডিয়েট দু'টোতেই স্টার

পাওয়া। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হলেন। ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে উঠার সময় তাঁর সৎবাবা (আমার বড়খালু) রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলেন। তখন খালা বললেন, জহিরের পড়ার খরচ আমি দিব কেন ? ও তো ফকিরের পুলা। আমার ছেলে তো না। ফকিরের পুলার পিছনে আমি কেন পয়সা নষ্ট করব ? আমার স্বামী নাই, প্রতিটা পাই পয়সা আমাকে হিসাব করে খরচ করতে হয়। ফকিরের পুলার পিছনে আমি আর একটা পয়সা খরচ করব না।

জহির ভাই তখন খালাকে বললেন, আমি তাহলে কী করব ?

খালা বললেন, তুই তোর বাপ মা'রে খুঁজে বের কর। পরের ঘাড়ে আর কতদিন বসে থাকবি ?

আলোচনার এই পর্যায়ে বাবা বললেন, বড়আপা, আপনারা একসময় আগ্রহ করে এই ছেলেকে পালক এনেছেন। এখন হঠাৎ করে...

বড়খালা বললেন, তোমার যদি এত দরদ থাকে তুমি পাল। তুমি তার পড়ার খরচ দাও।

বাবা বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, কষ্ট টষ্ট করে খরচ আমিই দিব। অনার্সটা পাশ করে ফেললে চাকরির চেষ্টা করা যাবে। বড় বড় লোকজন আমার পরিচিত। আব্দুল গনি নামে একজন আছে, পুরান ঢাকায় রিয়েল স্টেট করে কোটিপতি হয়েছে। তার সঙ্গে একসময় একখাটে ঘুমাতাম। তাকে গিয়ে যদি বলি— গনি! ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করে দাও। সে আমার কথা ফেলতে পারবে না। তার অসংখ্য ফার্ম। কোনো একটার ম্যানেজার বানায়ে দিবে। পোস্ট না থাকলে পোস্ট ক্রিয়েট করবে। এইটুকু আমার জন্যে তাকে করতেই হবে।

আমাকে ডাকতে হলো না। পনের মিনিট পার হবার আগেই জহির ভাই উঠে বসলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কতক্ষণ ঘুমিয়েছি ?

আমি বললাম, এগারো মিনিটেরও কম।

এতেই চলবে, শরীর ফ্রেশ লাগছে। এগারো মিনিটের মধ্যে ইন্টারেস্টিং স্বপ্ন দেখেছি। ইন্টারেস্টিং এবং ভয়াবহ।

কী স্বপ্ন ?

আমি একটা ঠেলাগাড়িতে বসে আছি। দু'জন মহিলা ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সামনের জনের মুখ দেখতে পাচ্ছি না। পেছনের জনের মুখ দেখতে পাচ্ছি। তাও ভালোমতো না। কারণ আমি যতবার মহিলার দিকে তাকাই, উনি মুখ ঘুরিয়ে নেন। এই হলো স্বপ্ন।

আমি বললাম, ইন্টারেস্টিং স্বপ্ন ঠিকই আছে। ভয়াবহ তো না।

অবশ্যই ভয়াবহ। দু'জন মহিলার কারোর গায়েই কাপড় নেই। একগাছা সুতাও নেই। আমার গায়েও কাপড় নেই। অথচ রাস্তার সবার পরনে কাপড়। সবাই আমাদের দেখে মজা পাচ্ছে— হাসছে। এখন বল, স্বপ্নটা ভয়াবহ না ?

হুঁ।

জহির ভাই উঠে দাঁড়ালেন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। আমার শার্টের পকেটে ঠিকানা লেখা কাগজ আছে। সেই ঠিকানায় যেতে হবে। বিকাল ছটা বাজে। সূর্য ডুববে ছয়টা পঁয়তাল্লিশে। সেই সময় ঘর থেকে বের হতে নেই। ঘর ছেড়ে বের হতে হলে আগেই বের হতে হবে।



দরজার পাশে কলিংবেল আছে। কলিংবেলের নিচে স্কচ টেপ দিয়ে সাঁটা নোটিশ—

হাত দিলে শক খাইবেন

বেল নষ্ট

আমি দরজার কড়া নাড়লাম। ঢাকা শহর থেকে কড়া বসানো দরজা উঠে গেছে বলেই জানতাম— এখানে আছে। চিপা ধরনের লিফট ছাড়া ফ্ল্যাট বাড়ি। গরিবদের জন্যে আজকাল এক বেডরুমের কিছু ফ্ল্যাট বানানো হচ্ছে। এটাও নিশ্চয়ই এরকম কিছু। সিঁড়িতে রেলিং বসানো শেষ হয় নি, এর মধ্যেই লোকজন উঠে গেছে।

ফ্ল্যাট নাম্বার আটের খ। দরজায় প্লাস্টিকের অক্ষরে বাড়িওয়ালা কিংবা ভাড়াটের নাম—

আবুল কালাম মিয়া

অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট

সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেটদের এমন দৈন্যদশা জানতাম না। আমি খানিকটা দ্বিধায় পড়ে গেছি। ভাইয়া এই ঠিকানা কাগজে লিখে দিয়েছে। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে— ঠিকানাটা ভুল। দরজার কড়া নাড়লেই অ্যাডভোকেট সাহেব বের হবেন এবং থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করবেন, কী চাই ?

ভুল ঠিকানা নিয়ে এসেছি বললেও যে অ্যাডভোকেট সাহেবের কাছ থেকে পার পাওয়া যাবে তা মনে হয় না। তিনি অবশ্যই নানান প্রশ্ন করবেন—

ভুল ঠিকানাটা কে দিয়েছে ? তার নাম, তার পরিচয় ? তোমার নাম ? তোমার পরিচয় ? ঠিকানা কী ?

আমি কড়া নাড়লাম। কলিংবেল টিপতে হয় একবার, কড়া নাড়তে হয় থেমে থেমে তিনবার। আমাকে তিনবার নাড়তে হলো না। দ্বিতীয় বারেই দরজা খুলে গেল। দরজার ওপাশে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরনে হলুদ লুঙ্গি। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। মুখ হাসি হাসি। যেন তিনি আমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।

আরে বাবলু তুই ? আয়, ভেতরে আয়।

বাবা ভেতরের দিকে মুখ করে আনন্দিত গলায় বললেন, এই দেখ কে এসেছে।

বসার ঘরের মেঝেতে তিন সাড়ে তিন বছরের একটা মেয়ে বসে আছে। তার চারদিকে সস্তার খেলনা ছড়ানো। সামনে একটা টেবিল ফ্যান। মেয়েটির স্বভাব মনে হয় প্রতিধ্বনির মতো যা শুনছে তাই নিজের মতো করে বলা। সে খেলনা থেকে চোখ না সরিয়ে রিনরিনে গলায় বলল, এই দেখ কে এসেছে।

বাবা আমার হাত ধরে ঘরের ভেতর টানতে টানতে বললেন, বাবলু এসেছে। বাবলু।

ছোট মেয়েটা বলল, বাবলু এসেছে, বাবলু।

বাবা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ধমক দিলেন, বাবলু কী রে ? নাম ধরে ডাকা বেয়াদব মেয়ে। তোর ভাই হয়। ভাইয়া ডাকবি।

মেয়েটা বিড়বিড় করে বলল, ভাইয়া।

রান্নাঘর থেকে অল্পবয়স্ক, আঠারো-উনিশ কিংবা তারচেয়ে কমও হতে পারে, একজন মহিলা উঁকি দিলেন। আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন।

বাবা বললেন, হা করে তাকিয়ে আছ কেন ? এই হলো বাবলু, My son. দেখেছ কী সুন্দর চেহারা!

মহিলা কী বলবেন ভেবে পেলেন না। শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে দিলেন। বাবা বললেন, তুই যে একদিন না একদিন আসবি আমি জানতাম। তুই আরাম করে বস তো। যূথী মা, ভাইয়ার দিকে ফ্যানটা দিয়ে দাও।

যূথী ফ্যান আমার দিকে ঘুরিয়ে দিল, আর তখনি মঞ্চে যার আবির্ভাব হলো তাকে আমি চিনি— আমাদের বাড়ির কাজের মেয়ে জিতুর মা। গোশতের শুঁটকির টিন নিয়ে সে এই বাসায় উঠেছে, এখন বুঝতে পারছি। জিতুর মা আহ্লাদী গলায় বলল, ও আল্লা, ভাইজান! কেমন আছেন ? বাসার সবেই ভালো ? আম্মাজানের আধ কপালী মাথাব্যথা এখনো হয় ?

বাবা বললেন, জিতুর মা, ফালতু বাত বন্ধ কর। বাবলু রাতে খাবে, এই ব্যবস্থা দেখ। টাকা নিয়ে যাও, হাফ কেজি খাসির মাংস নিয়ে আস। আচ্ছা ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি— তোমার যেতে হবে না। মাংস চিন না কিছু না। ভেড়ার মাংস নিয়ে আসবে, বোটকা গন্ধের জন্যে মুখে দেয়া যাবে না। বাবলু, তুই দশ মিনিট বসে থাকতে পারবি না ?

পারব।

যূথীর সঙ্গে বসে গল্প কর। আমি রিকশা নিয়ে যাব, রিকশা নিয়ে ফিরব। দশ মিনিটও লাগবে না। তুই বসে বসে চা খা। তোর চা শেষ হবার আগেই আমি চলে আসব।

আমিও যাই তোমার সঙ্গে ?

কোনো দরকার নেই, তুই যূথীর সঙ্গে গল্প কর।

আমি এবং যূথী বসে আছি। মেয়েটার চেহারা যে এত মায়াকাড়া আগে বুঝতে পারি নি। গোলগাল রোগা মুখে বড় বড় চোখ। চোখের মণি ঝলমল করছে। গায়ের রঙ একটু ময়লা। তাকে এই রঙটাই মানিয়েছে। এই মেয়েটা ফর্সা হলেও মানাতো না। কালো হলেও মানাতো না। তার মাথার চুল বেণি করা। দু'দিকে দুটা বেণি ছিল। একটা খুলে গেছে, এতেই মেয়েটাকে ভালো লাগছে। দুই বেণিতে একে মানাতো না। আমি বললাম, যূথী, তুমি কেমন আছ ?

যূথী বলল, ভালো না। আমার জ্বর। কপালে হাত দিয়ে দেখ।

সে মাথা আমার দিকে এগিয়ে দিল। নিতান্ত অপরিচিত একজনের সঙ্গে কী সহজ স্বাভাবিক আচরণ! আমি কপালে হাত দিলাম। যূথী ভুল বলে নি। তার সত্যিই জ্বর। একশ'র ওপর তো হবেই। এই জ্বর নিয়ে মেয়েটা নিজের মনে খেলছে। নিশ্চয়ই খুব লক্ষ্মী মেয়ে।

যূথী, তোমার কি অনেক খেলনা ?

হুঁ। আমার একশ' কোটি খেলনা।

কোন খেলনাটা তোমার সবচে' প্রিয় ?

আমার একটা তুলার হাতি আছে— সবচে' প্রিয়।

দেখি হাতিটা।

কীভাবে দেখবে! হারিয়ে গেছে তো।

তুমি খেলনা দিয়ে খেলা ছাড়া আর কী কর ?

আর কিছু করি না।

কেন, টিভি দেখ না ?

আমাদের টিভি নেই। বাবা গরিব তো, এই জন্যে টিভি নেই। গরিবদের টিভি থাকে না।

গরিবদের আর কী থাকে না ?

ফ্রিজ থাকে না। কিন্তু আমাদের ফ্রিজ আছে। তুমি ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি খাবে ?

খাব।

আচ্ছা আমি এনে দেব। আমার ঠাণ্ডা পানি খাওয়া নিষেধ। ঠাণ্ডা পানি খেলে আমার গলা ব্যথা হয়, এই জন্যে নিষেধ।

যূথী উঠে চলে গেল এবং গ্লাস ভর্তি করে ঠাণ্ডা পানি নিয়ে এলো। যূথীর মা তখন ঢুকছেন চা নিয়ে। চায়ের কাপ আমার সামনে রাখতে রাখতে চাপা গলায় বললেন, বাবা, চা খাও।

তাঁর মুখে 'বাবা' ডাক শুনতে অস্বস্তি লাগছে। তাঁরও মনে হয় অস্বস্তি লাগছে। তিনি একবারও আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। আমি বললাম, ঘরে কি থার্মোমিটার আছে ? যূথীর জ্বর কত দেখতাম।

ভদ্রমহিলা উঠে গেলেন এবং আমাকে থার্মোমিটার এনে দিলেন। তাঁর চোখে কৌতূহল। তিনি থেমে থেমে বললেন (এখনো আমার দিকে তাকাচ্ছেন না), মেয়েটার প্রায়ই জ্বর হয়। তোমার বাবাকে প্রায়ই বলি ভালো একজন ডাক্তার দেখাতে। সে সময় পায় না।

আমি যূথীর জ্বর দেখলাম, একশ' এক। যূথীর মা যূথীকে শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। বসার ঘরে আমি একা বসে আছি। বাবা দশ মিনিটের কথা বলে গেছেন। আধাঘণ্টা পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে যূথীর মা এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে অস্বস্তি, লজ্জা এবং কিছুটা ভয়। আমি বললাম, কিছু বলবেন ?

উনি বললেন, তোমাদের বাসায় কি সব জানাজানি হয়ে গেছে ?

আমি বললাম, জি।

আল্লাগো, এখন কী জানি হয়!

এই ফ্ল্যাট বাড়িটা কি আপনাদের ?

না। এক অ্যাডভোকেট সাহেবের বাড়ি। তোমার বাবা ভাড়া নিয়েছেন।

ভাড়া কত ?

সবকিছু নিয়ে চার হাজার টাকা। তুমি কি আরেক কাপ চা খাবে ? বানিয়ে দিব ?

না। আমি ঘনঘন চা খাই না।

এই ফ্ল্যাটের বারান্দা আছে। বারান্দাটা সুন্দর। বারান্দায় বসবে ?

না।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখতে ভালো লাগবে। বারান্দায় বসো, আমি আরেক কাপ চা বানিয়ে দেই, চা খাও। তোমার বাবার আসতে অনেক দেরি হবে। বাজার করতে উনার খুব দেরি হয়।

ভদ্রমহিলার আগ্রহের কারণেই বারান্দায় বসলাম। ছোট্ট বারান্দা। পাশাপাশি দু'টা মোড়া পাতা। বেশ কিছু টব। একটা টবে নীল অপরাজিতার লতানো গাছ। গাছ অনেক বড় হয়েছে। আরেকটা টবে সাদা সাদা ছোট ফুল। নাম জানি না— কিন্তু সুন্দর গন্ধ।

বারান্দা সুন্দর না ?

হুঁ।

যূথীকে এই বারান্দায় আসতে দেই না।

কেন ?

আমাদের ঠিক উপরের তলার বারান্দা থেকে একটা ছেলে নিচে পড়ে গেছে। চারতলা থেকে পড়েছে, কিন্তু কিছুই হয় নি। নিচে কনস্ট্রাকশানের জন্যে বালি রাখা হয়েছিল। ছেলেটা পড়েছে বালিতে, এই জন্যে কিছু হয় নি।

আমি বারান্দার মোড়ায় বসে আছি— ভদ্রমহিলা ঠিক আমার পেছনে দরজা ধরে দাঁড়ানো। তাঁর দ্বিধা এবং সংকোচ মনে হয় সামান্য কমেছে।

ঐ ছেলেটার নাম টগর। খুব দুরন্ত ছেলে। আমাদের বাসায় প্রায়ই আসে। যূথীর সঙ্গে খেলে।

আমি 'ও আচ্ছা' বলে চুপ করে গেলাম। ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে। বারান্দা থেকে বৃষ্টি দেখতে ভালো লাগছে।

তোমার বাবাকে অনেকদিন বলেছি তোমার মা'র কাছে সব স্বীকার করতে। সে রাজি না। তাঁর এক পীর সাহেব আছে, সেই পীর সাহেব বলেছে সব আপনা আপনি মিটমাট হবে।

ও আচ্ছা।

উনার মন দুর্বল তো, এই জন্যে শুধু পীর-ফকির করে। প্রায়ই শুনি অমুক পীরের কাছে গেছে, তমুক পীরের কাছে গেছে।

আপনি পীর-ফকির বিশ্বাস করেন না ?

না। এখন উনার এক পীর জুটেছে, সেই পীরের কাজ না-কি শুধু হাঁটা। পীর সাহেব হাঁটেন, পীর সাহেবের সঙ্গে তাঁর লোকজন হাঁটে। তোমার বাবা উনার কাছে যখন যান তখন বিরাট ঝামেলা হয়।

কী ঝামেলা ?

ছয়-সাত মাইল হেঁটে আসেন তো। পা ফুলে যায়। পায়ে স্যাক দিতে হয়। পা টিপে দিতে হয়। তোমার মা'র রান্না না কি খুব ভালো ?

জি ভালো।

তোমার বাবা আমাকে বলেছেন। আমি রাঁধতে পারি না। কখনোই আমার লবণের আন্দাজ হয় না। হয় বেশি হবে নয় কম হবে।

ও আচ্ছা।

বাসায় ফিরলাম রাত বারোটার দিকে। বাবা নিউ বিরানি হাউজ পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। গলা নিচু করে বললেন, My son, বাকি রাস্তা একা একা যেতে পারবি না ? আমি বললাম, পারব।

বাবা বললেন, That's good. এই মুহূর্তে ওদের সামনে পড়তে চাই না। বিসমিল্লাহ বলে চলে যা। আল্লাহু শাফি। আল্লাহু কাফি।

বাসায় এসে দেখি হুলস্থূল কাণ্ড। 'দি ইমেজ'-এর সামনে অনেক লোকজন হাঁটাহাঁটি করছে। পুলিশও আছে। আমাদের বাসার সব লাইটও জ্বলছে। বারান্দায় ভাইয়া এবং মা হাঁটাহাঁটি করছেন। আমি গেটে হাত রাখতেই ভাইয়া ছুটে এসে আমার হাত ধরল।

কই ছিলি এত রাত পর্যন্ত ? বাসা খুঁজে পেয়েছিলি ?

না।

খুঁজে না পেলে চলে আসবি। গাধা না-কি ? এত রাত পর্যন্ত কেউ বাইরে থাকে ? দিনকাল খারাপ। এদিকে বিরাট গণ্ডগোল।

কী গণ্ডগোল ?

ঘরে আয় সব শুনবি। বারান্দার লাইট সব নিভিয়ে দে। গেটে তালা লাগাতে হবে।

ভাইয়া ব্যস্ত হয়ে তালা লাগাতে গেল। মা আমাকে টেনে বাড়িতে ঢুকালেন। খাবার টেবিলে বসিয়ে বললেন, বাবলু, আয় আগে ভাত খা।

আমি বললাম, ভাত খেয়ে এসেছি মা।

ভাত কোথায় খেয়ে এসেছিস ?

ভাত খাই নি। ভুল বলছি। শরীর খারাপ লাগছে। বাসা খুঁজতে গিয়ে অনেক হাঁটাহাঁটি। বৃষ্টিতে ভিজেছি, এই জন্যে বোধহয় শরীর খারাপ করেছে। বমি আসছে।

বাসা খোঁজাখুঁজির কোনো দরকার নাই। আমরা পাকা খবর পেয়েছি। যে অ্যাডভোকেট সাহেবের বাসায় সে থাকে, উনিই খবর দিয়েছেন।

আমি বললাম, ভাইয়া বলছিল, এদিকে গণ্ডগোল। কী গণ্ডগোল ?

সকালে শুনিস। রাতে শোনার দরকার নেই।

এখনি বলো।

ভিডিওর দোকানে গণ্ডগোল হয়েছে। গোলাগুলি। খুনাখুনি।

কে করেছে গোলাগুলি ?

ভিডিওর দোকানের ম্যানেজার। কাদের নাম। মালিককে গুলি করেছে— মালিকের সঙ্গে তার জানি দোস্ত আমাদের ছাগলটা ছিল। সে-ও গুলি খেয়েছে।

জহির ভাই গুলি খেয়েছে ?

হুঁ।

কেউ মারা গেছে না-কি ?

দু'জনই বোধহয় মারা গেছে। লোকজন তাই বলছে। অ্যাম্বুলেন্স এসে নিয়ে গেছে। পুলিশ এই বাড়িতেও এসেছিল। খোকনের সঙ্গে কথাবার্তা বলল।

কী কথা বলল ?

জানি না। জিজ্ঞেস করি নি।

আমি মা'র দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পান খাচ্ছেন। ঠোঁটে চুন লেগে আছে। তাঁর চেহারায় চোখে-মুখে শান্তি শান্তি ভাব। জহির ভাই অনেকদিন এ বাড়িতে আছেন। তিনি পালক পুত্র হন যাই হন তিনি তো আমাদেরই একজন। তিনি গুলি খেয়েছেন। লোকজন বলছে সম্ভবত মারা গেছেন। এ নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই।

সত্যি ভাত খাবি না ?

না।

দুধ খাবি ? এক কাপ দুধ দেই, খা।

না।

তাহলে যা হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়।

জহির ভাইয়ের কোনো খোঁজ নেব না ?

এই নাম এখন কিছুদিন মুখেও আনবি না। পুলিশের তদন্ত-টদন্ত শেষ হোক। তারপর।

যদি মারা গিয়ে থাকেন ?

মারা গেলে পুলিশ খবর দিবে। শহরের মাঝখানে জোড়াখুন বিরাট ঘটনা। চ্যানেল আই-এর নিউজে দেখিয়েছে। জহিরকেও দেখিয়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল, চেহারা বোঝা যায় নাই। তুই এইসব নিয়ে চিন্তা করিস না। ঘুমোতে যা। সকালে পুলিশের এসবি'র লোক আসবে। খোকনকে বলে গেছে। তোর সঙ্গে হয়তো কথাবার্তা বলবে। জহির তোর ঘরে ঘুমাত এই জন্যে। কী বলবি না বলবি খোকন তোকে শিখিয়ে দেবে।

শিখিয়ে দিতে হবে কেন ?

কোনটা বলতে গিয়ে কী বলে কোন ঝামেলায় পড়বি! পুলিশের চেষ্টাই থাকে ঝামেলা তৈরি করা। ঝামেলা হলে তারা দু'টা পয়সা পায়। সবার পয়সার দরকার। পুলিশের দরকার সবচে' বেশি। তুই এক কাজ কর, ঘুমুতে যাবার আগে খোকনের কাছ থেকে সব জেনে যা। সে যা শিখিয়ে দেবে তার বাইরে একটা কথা বলবি না।

ভাইয়া যা শিখিয়ে দিল তা হচ্ছে— জহির ভাই আমাদের পরিবারের কেউ না। আমার বড়খালু দয়াপরবশ হয়ে তাকে বাড়িতে আশ্রয় দেন। সেই থেকেই সে আমাদের সঙ্গে আছে। তবে সে এখন আর আমাদের সঙ্গে থাকে না। দি ইমেজে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ আসে। রাত বেশি হলে আমার ঘরে থেকে যায়। এর বেশি আমরা কিছু জানি না। ভাইয়া বিশেষ করে বলে দিল যেন ভুলেও না বলি বড়খালু জহির ভাইকে পালক এনেছিলেন।

ভাইয়ার সঙ্গে কথাবার্তার এক পর্যায়ে আমি মিনমিন করে বললাম, ভাইয়া, চল না জহির ভাইয়ের অবস্থা কী একটু খোঁজ নিয়ে আসি ?

ভাইয়া শান্ত গলায় বলল, অনেকগুলি কারণে এই কাজটা করা যাবে না। প্রথম কারণ, পুলিশ তাকে কোন হাসপাতালে নিয়ে গেছে আমরা জানি না। রাতদুপুরে হাসপাতালে হাসপাতালে ঘোরা সম্ভব না। দ্বিতীয় কারণ, খুনখারাবি যখন ঘটে তখন পুলিশের সন্দেহভাজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দেখানো যায় না। তৃতীয় কারণ, জহির ভাই আমাদের এমন কেউ না যে তার খোঁজে হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরতে হবে। চতুর্থ কারণ,...

ভাইয়া এমনভাবে কথা বলছে যেন পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। পয়েন্ট বাই পয়েন্ট উত্তর। কোনো পয়েন্ট যেন বাদ না পড়ে। পরীক্ষায় যে প্রশ্ন এসেছে সেটা হলো— জহিরের খোঁজে না যাওয়ার পেছনে তোমার যুক্তিগুলি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

বাবলু!

জি ভাইয়া।

জহিরের ব্যাপারটা মাথা থেকে দূরে রাখবি। তোর স্বভাব হচ্ছে, তুই যার কাছেই যাস তার ছায়া হয়ে যাস। এটা ঠিক না। সবাইকে আলাদা আইডেনটিটি নিয়ে বড় হতে হবে। তুই ছায়া মানব না। You are not a shadow man. যা ঘুমুতে যা।

আমি ঘুমুতে গেলাম। পাশের ঘরে বড়খালা জেগে আছেন। কোনো হিন্দি মুভি দেখছেন। মারপিটের দৃশ্য হচ্ছে। ঢিসুম ঢিসুম শব্দ হচ্ছে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র থাকার পরেও হিন্দি মুভিতে প্রথম বেশ কিছুক্ষণ কিলঘুসির দৃশ্য থাকে। ঘুসি খেয়ে কেউ না কেউ তরকারিভর্তি ভ্যানগাড়িতে পড়ে। ভ্যান ভেঙে সে তরকারি সুদ্ধ নিচে পড়ে। মারামারির সঙ্গে তরিতরকারির সম্পর্ক আমি এখনো ধরতে পারি নি।

শোবার আগে বড়খালা 'দি ইমেজ'-এর ঘটনা কীভাবে নিচ্ছেন জানার জন্যে তাঁর ঘরে ঢুকলাম। বড়খালা টিভি থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে বললেন, সবুজ শাড়ি পরা যে মেয়েটা দেখছিস সে-ই আসল খুনি। তবে সে নিজেও জানে না সে খুনি।

আমি বললাম, তাই নাকি ?

মেয়েটা খুন করে ঘোরের মধ্যে।

আমি বললাম, জহির ভাই যে খুন হয়েছে শুনেছ ?

বড়খালা বললেন, দুটা মিনিট পরে কথা বল তো! ছবি এখনই শেষ হয়ে যাবে। তুইও দেখ। শেষটা এরা ইন্টারেস্টিং বানিয়েছে।

আমি চোখ বড় বড় করে সবুজ শাড়িওয়ালির অভিনয় দেখে শেষ করলাম। বড়খালা হাই তুলতে তুলতে বললেন, বাবলু, তুই একজন এসির মিস্ত্রি নিয়ে আসিস। এসিতে কোনো গণ্ডগোল আছে, ঘর আগের মতো ঠাণ্ডা হচ্ছে না। মনে হয় গ্যাস চলে গেছে।

আচ্ছা নিয়ে আসব।

তুই কি আম চিনিস ? খিরসাপাতি আম কিনে আনতে পারবি ? এক কেজি খিরসাপাতি আম আনিস তো। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাস। আম কিনে আমার হাতে দিবি।

তোমার আঙুলে কী হয়েছে ?

খালা বিরক্তচোখে নিজের বাঁ হাতের আঙুল মেলে ধরলেন। দুটা আঙুল ব্যান্ডেজ করা। গজ-তুলা দিয়ে ব্যান্ডেজ। একটা আঙুল থেকে রক্ত চুঁইয়ে ব্যান্ডেজের বাইরে চলে এসেছে। আঘাত নিশ্চয়ই গুরুতর।

আঙুলে ব্যথা পেয়েছ কীভাবে ?

ব্যথা পাই নি। কামড় দিয়েছে।

কে কামড় দিয়েছে ?

একটা দুষ্টু ভূতের বাচ্চা আমার খাটের নিচে থাকে, বলেছি না! সেটাকে ঝাড়ু দিয়ে মারতে গেছি, ফট করে সে আঙুল কামড়ে ধরেছে। এমন বদ!

ভূতের বাচ্চাটাকে বিদায় করতে পেরেছ, না-কি এখনো সে খাটের নিচে ঘাপটি মেরে বসে আছে ?

আমি জানি না। তুই উঁকি দিয়ে দেখ। তবে আমি ঠিক করেছি, ঐটাকে আর ঘাঁটাব না। সে তার মতো থাকুক। বুড়া বয়সে আর কামড় খাব না। কামড় দিয়ে যখন রক্তারক্তি করে ফেলল তখন খোকন ডাক্তার নিয়ে এলো। চেংড়া ডাক্তার। পড়াশোনা করে পাস করেছে, না নকল করে পাস করেছে কে জানে! ডাক্তার বলল, কিসে কামড় দিয়েছে ? আমি বললাম, ভূতে কামড় দিয়েছে। ডাক্তার এমনভাবে তাকাল যেন আমার মাথা খারাপ। তোর কি ধারণা আমার মাথা খারাপ ?

আমি বললাম, না।

ভূতগুলা এত জায়গা থাকতে আমার খাটের নিচে বসে থাকে কেন বল দেখি ?

তুমি দিনরাত এসি চালিয়ে রাখ। ঘর থাকে ঠাণ্ডা। ভূতরা মনে হয় ঠাণ্ডা পছন্দ করে।

হতে পারে। তোর বুদ্ধি খারাপ না। আমি এই লাইনে চিন্তাই করি নি। আরেকটা ছবি চালা তো। টেবিলের উপরে আছে। উপর থেকে তিন নম্বর সিডিটা দে— 'ম্যায় হুঁ না'। শাহরুখ খানের ছবি। নায়িকা সুস্মিতা সেন। চিনিস না সুস্মিতাকে ?

না।

মিস ইন্ডিয়া হয়েছিল। পরে মিস ইউনিভার্স হয়েছে। ফিগার খুব সুন্দর। তবে তাকে নিয়ে নানান গুজব আছে। আয় আমার সঙ্গে ছবি দেখ।

ঘুম পাচ্ছে খালা। ঘুমাব।

যা ঘুমা।

মন বিক্ষিপ্ত থাকলে ঘুম ভালো হয় না, এমন কথা প্রচলিত আছে। আমার বেলায় কথাটা একেবারেই খাটে না। আমার ঘুম তখন অনেক ভালো হয়। এক ঘুমে রাত পার করে দিলাম। ছোট ছোট কয়েকটা স্বপ্ন দেখলাম। এর মধ্যে একটা স্বপ্নে জহির ভাই স্ট্রেচারে শুয়ে আছেন। বড়খালা সেই স্ট্রেচার ঠেলছেন। জহির ভাই বলছেন, আস্তে ঠেল মা। আস্তে। আমার শরীরে বিরাট জখম। জহির ভাই যে কথাগুলি বলছেন সেই কথাগুলি আবার একজন নার্স 'রিপিট' করছে। জহির ভাই বললেন, আমার শরীরে বিরাট জখম। নার্স বলল, আমার শরীরে বিরাট জখম। জহির ভাই বললেন, মা, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? নার্স বলল, মা, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? এই কথায় বড়খালা রেগে গিয়ে বললেন, তুমি আমাকে মা ডাকছ কেন ? তুমি কে ? খালার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নার্সটা একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে হয়ে গেল। স্বপ্নে এই বিষয়টা মোটেই অবাস্তব মনে হলো না। মনে হলো এটাই স্বাভাবিক। বাচ্চা মেয়েটা বলল, আমার নাম যূথী। আমার জ্বর। কপালে হাত দিয়ে দেখ। এই বলে সে বড়খালার দিকে মাথা এগিয়ে দিল। স্বপ্ন এখানেই শেষ।



দ্বিতীয় আলো পত্রিকায় 'দি ইমেজ' হত্যাকাণ্ডের বিবরণ প্রথম পৃষ্ঠায় লিড নিউজ হয়েছে। সংবাদের শিরোনাম— 'রাজধানীর কেন্দ্রে আবারো নৃশংস খুন'। একজন নিজস্ব সংবাদদাতা ঘটনার এমন নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন যা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে হত্যাকাণ্ডের সময় তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন। হত্যাকারীর সঙ্গে হত্যার মোটিভ নিয়ে কথাবার্তাও হয়েছে।

প্রতিবেদকের বক্তব্য থেকে জানা গেল, জহির ভাই বেঁচে আছেন। তাঁর ডান পা এবং ডান হাতে গুলি লেগেছে, তবে ডাক্তাররা তাকে শঙ্কামুক্ত ঘোষণা করেছেন। এবং কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হবে। পুলিশের ধারণা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে দি ইমেজের ম্যানেজার মোহম্মদ নাসিম। হত্যাকাণ্ডের কয়েক দিন আগেই দি ইমেজের মালিকের সঙ্গে তার বচসা হয় এবং চাকরি চলে যায়। মোহম্মদ নাসিম বর্তমানে পলাতক আছে। পুলিশ তার সন্ধানে আছে। তাকে গ্রেফতার করতে পারলেই সব রহস্যের সমাধান হবে।

আওয়ামী লীগ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দি ইমেজের মালিক ফারুক এবং তার বন্ধু জহির দুজনই আওয়ামী যুবলীগের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। ক্ষমতাসীন সরকার ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে পরিকল্পিতভাবে আওয়ামী কর্মীদের হত্যা করে যাচ্ছে। ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে যাওয়া এই খুনি সরকারের পতনের জন্যে মুক্তিযুদ্ধের সকল স্বপক্ষ শক্তিকে এক হতে আহ্বান জানিয়েছে আওয়ামী লীগ। দলীয় কর্মীদের ওপর এই বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ আগামী বৃহস্পতিবার সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দিয়েছে।

এদিকে বিএনপি থেকে বলা হয়েছে, এই দুজনই জিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবদলের কর্মী। একজন (মোহম্মদ ফারুক) যুবদল নগর কমিটির ক্রীড়া পরিষদের সদস্য। বিরোধী দল দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির জন্য পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। তাদের সমুচিত জবাব দেয়া দেশপ্রেমিক জনতার কর্তব্য। বিএনপি উন্নয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। সন্ত্রাসের রাজনীতিতে বিশ্বাসী না।

জহির ভাই আওয়ামী লীগের লোক না-কি বিএনপি'র লোক আমি জানি না। একটা জিনিস জানি, তাঁকে দেখতে যাওয়া দরকার। ভাইয়ার নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করেই যেতে হবে। কাউকে কিছু না জানিয়ে হুট করে উপস্থিত হতে হবে। তিনি কোথায় আছেন এই তথ্য এখন জানি। পত্রিকায় লিখেছে।

জহির ভাই খবরের কাগজ পড়ছিলেন। আমাকে দেখে একপলক তাকিয়ে আবার কাগজ পড়ায় মন দিলেন। তাঁর ডান হাতে ব্যান্ডেজ। একহাতে পত্রিকা ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। ফ্যানের বাতাসে পত্রিকা এলোমেলো হচ্ছে। সামলানো যাচ্ছে না। জহির ভাইকে রাখা হয়েছে কেবিনে। কেবিনের দরজার সামনে একজন বন্দুকধারী পুলিশ। সে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করছে না। যার ইচ্ছা জহির ভাইয়ের কেবিনে ঢুকছে, বের হচ্ছে।

আমি খাটের পাশে রাখা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, কেমন আছ ?

জহির ভাই বললেন, কাগজ পড়ছি দেখছিস না! পড়া শেষ করি, তারপর আলাপ।

আমি কি কাগজটা ধরব ? তুমি তো একহাতে কাগজ ধরতে পারছ না ?

জহির ভাই জবাব দিলেন না। আমি কেবিনের সাজসজ্জা দেখায় মন দিলাম। ঘরটা বেশ বড়। সঙ্গে এটাচড টয়লেট। টয়লেট থেকে পানি পড়ার শব্দ আসছে। হাসপাতালের কেবিনের টয়লেটে পানির কল নষ্ট থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। আমি যে কয়বার হাসপাতালের কেবিনে গিয়েছি, প্রতিবারই এই জিনিস দেখেছি।

খাটের মাথার দিকে সাদা রঙ করা লোহার টেবিল। যেখানে যেখানে রঙ উঠে গেছে সেখানে লোহায় মরিচা পড়ে গেছে। টেবিলে কমলা এবং আঙুর রাখা আছে। বাংলাদেশে ফলের ব্যাপারে বিপ্লব হয়ে গেছে। সারা বছরই কমলা, আঙুর, আপেল পাওয়া যায়। রোগী দেখতে লোকজন কমলাই বেশি নিয়ে যায়। আমি এখন পর্যন্ত কাউকে আম নিয়ে রোগী দেখতে যেতে দেখি নি। রোগীদের জন্যে আম কি নিষিদ্ধ ? আমের কথায় মনে পড়ল, বড়খালার জন্যে খিরসাপাতি আম কিনতে হবে। তিনি টাকা দিয়ে দিয়েছেন। খিরসাপাতি আমের কেজি কত টাকা করে কে জানে ?

জহির ভাই পত্রিকা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন।

আমি বললাম, হাসপাতালে সিগারেট খেতে দেয় ?

জহির ভাই বললেন, দিবে না কেন ? হাসপাতাল তো আর মসজিদ না, যে, কোনো নেশা করা যাবে না।

তুমি আছ কেমন ?

ভালো। ইচ্ছা করলে আজই রিলিজ নিয়ে চলে যেতে পারি। যাচ্ছি না, ঠিক করেছি কিছু দিন রেস্ট নেব। রেস্ট নেবার জন্যে হাসপাতাল খারাপ না।

খাওয়া কি হাসপাতাল থেকে দেয় ?

দেয়। খাওয়া সুবিধার না, আমি হোটেল থেকে খাওয়া আনাই। এখানে ডাক্তারদের একটা ক্যান্টিন আছে, তারা দুপুরে ভালো বিরানি বানায়। দুপুর পর্যন্ত থাক, বিরানি খেয়ে যা।

আচ্ছা। জহির ভাই, তোমাকে কিন্তু সুন্দর লাগছে। কয়েকদিন শেভ না করায় খোঁচা খোঁচা দাড়ি বের হওয়ায় চেহারা বদলে গেছে।

সাধু সাধু চেহারা হয়েছে না ?

হুঁ।

চা খাবি ?

খাব।

না-কি কফি খাবি ? ক্যান্টিনে কফিও পাওয়া যায়। দশ টাকা কাপ।

কফিও খেতে পারি।

জহির ভাই শোয়া থেকে আধশোয়া হলেন। তাঁর হাতে সিগারেট। তিনি খুবই আরাম করে সিগারেট টানছেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সব মানুষের আলাদা কিছু বিশেষত্ব থাকে। তোর বিশেষত্ব কী জানিস ?

না।

তোর বিশেষত্ব হচ্ছে, তুই কোনো কিছুতেই না বলতে পারিস না। বিরানি খেতে বললাম, তুই রাজি। চা খেতে বললাম রাজি। কফি খেতে বললাম তাতেও রাজি। তুই কি না বলতে পারিস না ?

পারি, কিন্তু বলতে ইচ্ছা করে না।

তুই অনেকক্ষণ হয়েছে আমার কাছে এসেছিস। এখনো একবারও জিজ্ঞেস করিস নি, ঐ রাতে কী ঘটেছিল। এটাও তোর একটা বিশেষত্ব।

তোমার বিশেষত্ব কী ?

আমারটা আমি বলব কেন, তুই বলবি। এক্ষুনি বলতে হবে না। চিন্তা ভাবনা করে বের কর, তারপর তোর কাছ থেকে জেনে নেব। টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে মানিব্যাগ বের কর। পঞ্চাশ টাকার একটা নোট পুলিশ ভাইজানকে দে, তিন কাপ কফি নিয়ে আসবে। সে নিজে এককাপ খাবে। আর পনেরশ' টাকা তোর। ধার নিয়েছিলাম, ধার শোধ করলাম। ঐ রাতে মরে গেলে তো ধার শোধ হতো না।

জহির ভাই হাসছেন। একটা মানুষের হাসি এত সুন্দর! এখন কেবিনে শুধু আমরা দু'জন। পুলিশ ভাইজান কফি আনতে আগ্রহের সঙ্গেই গিয়েছেন। জহির ভাইয়ের কাছে শুনেছি, সে কোনো বাজার সদাইয়ের কাজ খুব আগ্রহের সঙ্গে করে, শুধু টাকা ফেরত দেয় না। একশ' টাকার নোট দিয়ে এক প্যাকেট বেনসন সিগারেট আনতে তাকে পাঠালে সে সিগারেট আনবে। সঙ্গে দু'টা দেয়াশলাই আনবে, শুধু বাকি টাকাটা ফেরত দেবে না। এমন ভাব করবে যেন এক প্যাকেট বেনসন সিগারেট এবং দুটা দেয়াশলাইয়ের দাম কাঁটায় কাঁটায় একশ' টাকা।

বাবলু!

জি জহির ভাই।

আজকের কাগজে বিনোদন পাতা ছাপা হয়েছে। সেটা পড়েছিস ?

না।

নীলার ছবি ছাপা হয়েছে বিনোদন পাতায়।

তাই নাকি ?

পরিচালক মুকুল সাহেব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দৃশ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন, এরকম একটা ছবি। নীলা আছে পরিচালকের পাশে, সে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। পরিচালক সাহেবের কথা গিলছে এমন ভাব। পেপারটা হাতে নিয়ে ছবিটা দেখ।

আমি ছবি দেখলাম। জহির ভাই ভুল বলেন নি। নীলা ফুপু সত্যি সত্যি বিকট হাঁ করে আছে। নীলা ফুপু জহির ভাইয়ের চেয়ে এক দু'বছরের ছোট। জহির ভাই তাকে সে জন্যেই নাম ধরে ডাকে। সম্পর্ক হিসেবে জহির ভাইয়েরও উচিত তাকে ফুপু ডাকা। তা সে ডাকবে না। আমার ক্ষীণ সন্দেহ, জহির ভাই নীলা ফুপুকে খুবই পছন্দ করে। যদিও এই পছন্দের ব্যাপারটা সে কখনো বলে নি। একবার ফুপুর অ্যাপেন্ডিস অপারেশন হয়। তাঁকে সারারাত হাসপাতালে থাকতে হলো। জহির ভাইও সারারাত কাটালেন হাসপাতালের বারান্দায়।

জহির ভাই দ্বিতীয় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, বাবলু শোন, নীলার কি ঐ পরিচালক সাহেবের সাথে খুব ভাব ?

মনে হয় ভাব।

তোদের বাসায় আসে মাঝে-মধ্যে ?

আমি কখনো আসতে দেখি নি। বোধহয় আসে না।

নীলা যদি চা খাবার দাওয়াত দেয় তাহলে আসবে না ? বাসায় আসল, চা কেক চানাচুর খেল। আমি তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলাম।

তোমার পরিচয় করার দরকার কী ?

বিখ্যাত একজন মানুষের সঙ্গে পরিচয় থাকা ভালো না ?

জহির ভাই হাসছেন। এই হাসি আগের হাসির মতো সুন্দর না। যে মানুষ সুন্দর হাসি হাসে, সে অসুন্দর হাসিও হাসে। কিন্তু সে নিজে কি সেটা জানে ?

জহির ভাই, তোমাকে একটা প্রশ্ন করব। উত্তর দিতে চাইলে দেবে। দিতে না চাইলে নাই।

কঠিন প্রশ্ন ?

না, প্রশ্নটা সোজা, তবে উত্তর বেশ কঠিন।

তুই হেঁয়ালিতে কথা বলা শুরু করেছিস কবে থেকে ? প্রশ্ন কর।

দি ইমেজের মালিককে তুমি গুলি করেছ, তাই না ?

হ্যাঁ। আর কে করবে ? তুই বুঝলি কী করে ?

তোমার ডানহাতে গুলি লেগেছে, সেখান থেকে বুঝতে পেরেছি। তুমি লেফট হ্যান্ডার। পিস্তল থাকবে তোমার বাঁ হাতে। নিজেকে যদি গুলি কর তাহলে ডান হাতেই গুলি করবে।

Good logical deduction. ফেলুদার বই আজকাল বেশি বেশি পড়ছিস না-কি ?

পুলিশ ভাইজান কফি নিয়ে এসেছে। কফির সঙ্গে সে নিজ থেকেই এক প্যাকেট নোনতা বিসকিটও এনেছে। জহির ভাই কফিতে বিসকিট ভিজিয়ে বেশ মজা করে খাচ্ছেন। চায়ে বিসকিট ভিজিয়ে লোকজন খায়। কফিতে বিসকিট ভিজিয়ে কেউ খায় বলে আগে শুনি নি।

জহির ভাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই কি ম্যাকবেথ ভাইজানকে চিনিস ?

না-তো!

না চিনলেও চলবে। ম্যাকবেথ ভাইজান জীবন সম্পর্কে কী বলেছেন মন দিয়ে শোন।

Life is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.

বুঝেছিস কিছু ?

না।

সারকথাটা হলো, জীবন চিল্লাফাল্লা ছাড়া কিছু না। জীবন নিয়ে চিন্তা ভাবনার কিছু নাই। যা তুই এখন বিদেয় হ। আমি ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমাব।

দুপুরে বিরানি খাব না ?

আরেকদিন এসে খেয়ে যাবি। টেবিলের উপর দেখ, হলুদ রঙের ট্যাবলেট আছে, দে। খেয়ে ঘুম দেই।

ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে হবে কেন ?

ওষুধ না খেয়েই বা ঘুমাতে হবে কেন ?

আমি উঠে দাঁড়ালাম। কেবিন থেকে বের হবার সময় পুলিশ বলল, ছোটভাই, আবার আসবেন।

খিরসাপাতি আম মুখে দিয়ে বড়খালা খুব রাগ করলেন। আমার দিকে আগুন আগুন চোখে তাকিয়ে বললেন, এটা খিরসাপাতি ?

খিরসাপাতি না ?

না মিষ্টি, না টক— এটা কী ? তুই খেয়ে আনিস নাই ?

না।

অন্যের পয়সা নষ্ট করছিস, এইজন্যে খেয়ে আনিস নাই। অন্যের পয়সা নষ্ট করতে মজা লাগে ? যা আম ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে আয়।

এরা ফেরত নিবে না। গরিব মানুষ। এরা রাস্তার পাশে ঝুড়ি নিয়ে বসে। বিক্রি করা আম ফেরত নিলে এদের পোষে না।

তুই ফুটপাত থেকে খিরসাপাতি আম কিনে এনেছিস ? এটা ফুটপাতের আম ? যা, আম নিয়ে বিদায় হ। ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে আয়। এক্ষুনি যা।

যে আমের অর্ধেকটা তুমি খেয়েছ সেটা তো ফেরত নিবে না।

অবশ্যই ফেরত নিবে। তার বাপ ফেরত নিবে।

খুবই আশ্চর্যের কথা, আমওয়ালা আম ফেরত নিল। আমাকে বলল, কেন ফেরত নিব না ? আপনে রইদে ঘামতে ঘামতে আসছেন। চউখ-মুখ লাল হয়ে গেছে— আমি ফেরত নিব না— এটা কেমন কথা! তবে বাবা, এই আম কিন্তু আসল খিরসাপাতি। মধুর চেয়ে মিষ্ট। নেন একটা খান। কোনো দাবি নাই। একটা দু'টা যে কটা ইচ্ছা খান।

আমি আম খেলাম। আমওয়ালা কথা ভুল বলে নি। আসলেই মধুর মতো মিষ্টি। বড়খালার কাছে পানশে লাগল কেন কে জানে।

আমার নাম রমজান। বাপে রোজার মাসের নামে নাম রাখছে বইল্যা মিথ্যা বলতে পারি না। মিথ্যা ব্যবসাও করতে পারি না। নামের কারণে ধরা খাইছি। আম মিষ্টি কিনা বলেন ?

অবশ্যই মিষ্টি।

আমের মিষ্টি কিন্তু মূল না। চিনিও মিষ্টি। চিনি কি আম ? আমের আসল স্বাদ ঘেরানে। একটা আম আছে দিনাজপুর এলাকায় হয়, নাম কদমখাস। খুবই অল্প পরিমাণ হয়। পাওয়া যায় না বললেই হয়। কদমখাস যে একবার খাইছে তার মুখে অন্য আম রুচবে না। হিমসাগর, গোপালভোগ মুখে নিয়া থু কইরা ফেলবে।

কী নাম বললেন ?

কদমখাস।

কদমখাস আম খেতে ইচ্ছা করছে।

এক সপ্তাহ পরে খোঁজ নিয়েন। দেখি খাওয়াইতে পারি কিনা। আল্লাহপাকের হুকুম হইলে খাওয়াইতে পারব। হুকুম না হইলে উপায় নাই। এই যে এত ভালো আম আপনে ফেরত আনছেন— আল্লাহপাক হুকুম করেছেন বলে ফেরত আনছেন।

আম ফেরত আনার মতো তুচ্ছ বিষয়েও আল্লাহপাক হুকুম দিবেন ?

অবশ্যই। যিনি সব কিছু হিসাবের মধ্যে রাখেন তার কাছে কোনো কিছুই তুচ্ছ না। নেন, এই আমটা খান। দাবি ছাড়া দিতেছি। আপনের সাথে আমিও একটা খাব।

এই আমটার নাম কী ?

অনেকে অনেক নামে ডাকে, আসল নাম মধুমুখা।

মধুমুখা ?

জি মধুমুখা। এই আমের মুখ মধুর মতো মিষ্টি। মুখ থাইকা যতই নিচে নামবেন ততই চোকা হবে। এইটা আরেক মজা।

দু'জন দুটা মধুমুখা খেয়ে শেষ করলাম। রমজান মিয়া ঝুড়ি বেছে আরো দু'টা আম বের করল, নাম সন্ন্যাসীভোগ।

খান খান, কোনো দাবি নাই। আপনের উছিলায় আমি খাইতেছি। আল্লাহপাক হুকুম করেছেন— 'আমার এই দুই পিয়ারা বান্দা আষাঢ় মাইস্যা রইদে বইসা আম খাবে। আম খায়া মজা পাবে। এই দুই বান্দার মজা দেইখা আমি খুশি হবো।' উনার হুকুমেই আমরার খাইতে হইতেছে। নিজের ইচ্ছায় তো কিছু করার উপায় উনি রাখেন নাই। উনি আজিব একজন।

আমরা মহানন্দে আম খেয়ে যাচ্ছি। আগুনঝরা রোদ উঠেছে। কাক রোদ-বৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামায় না, আজ তারাও ছায়া খুঁজছে। কয়েকটা কাক কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বসে ঝিমাচ্ছে। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। আকাশ নীল কাচের মতো ঝকঝকে। আকাশের দিকে তাকালে দৃষ্টি ঠিকরে আসে।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, লু হাওয়ার মতো গরম হাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ কোত্থেকে যেন শীতল হাওয়া এসে গায়ে লাগছে। যতবারই এই হাওয়া লাগছে ততবারই আমি চমকে উঠছি। রমজান মিয়া গামছা দিয়ে মুখে লেগে থাকা আমের রস মুছতে মুছতে বলল, এই যে ঠাণ্ডা হাওয়া হঠাৎ কইরা আহে, এই হাওয়ার নাম লিলুয়া বাতাস। আল্লাহপাক তাঁর রহমতের জানালা মাঝেমধ্যে খোলেন, তখন এই হাওয়া আহে। আইজ আমাদের উপরে আল্লাহর রহমত নাজেল হইছে। সোবাহানাল্লাহ্।



আমার মা'র নাম আফিয়া বেগম। এমন কোনো বড় নাম না, তারপরেও এই নামটা ছোট করে বাবা ডাকতেন আফি। ই-কারের টান যখন দীর্ঘ হতো তখন বোঝা যেত বাবার মেজাজ শরিফ। এখানেই শেষ না, নাম নিয়ে বাবার দু'টা ছড়াও ছিল। যেমন—

১

আফি আফি
করতে হবে মাফি

২

আফি আফি
You are কাফি

প্রথম ছড়াটা বাবা বেশি বলতেন। মা'র চোখে মুখে তখন আনন্দ ঝরে পড়ত। মা হচ্ছেন স্বামীর প্রতিভায় মুগ্ধ হওয়া গোত্রের মহিলা। এই জাতীয় মহিলাদের চোখে একধরনের অদৃশ্য চশমা থাকে। যে চশমা স্বামীদের যাবতীয় ত্রুটি ফিল্টার করে রেখে দেয়। তাঁদের চোখে স্বামীদের গুণাবলিই শুধু ধরা পড়ে।

আমরা যখন ভাড়াবাড়িতে থাকতাম তখন বাবা প্রথম মিল্লাত কোম্পানির একটা সিলিং ফ্যান কিনলেন। সেই ফ্যান বসার ঘরে লাগানো হলো। সুইচ টেপার পর ফ্যান থেকে বৃদ্ধ মানুষদের ধারাবাহিক কাশির মতো ঘড়ঘড় আওয়াজ হতে লাগল। আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। ভাইয়া বলে ফেলল, এত শব্দ! মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ফ্যানে একটু আধটু শব্দ তো হবেই। হাওয়া কত এটা দেখবি না? ঝড়-তুফানের মতো হাওয়া।

বাবা বললেন, ফ্যানটা বদলায়ে নিয়ে আসি?

মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তুমি আবার কষ্ট করে গরমের মধ্যে ফ্যান নিয়ে যাবে! কোনো দরকার নেই। ফ্যানে শব্দ হওয়া ভালো, বোঝা যায় একটা জিনিস চলছে।

মা'র প্রতি বাবার প্রেমও চোখে পড়ার মতোই। যে দোতলা বাড়িতে আমরা বাস করছি (তিনতলার ফাউন্ডেশন, দোতলা) তার নাম আফিয়া মহল। বাড়ির গেটে শ্বেতপাথরে বাড়ির নাম লেখা আছে। বাবার ঝোঁক হচ্ছে সস্তায় কাজ করানো। শ্বেতপাথরের নামফলকটাও তিনি অতি সস্তায় করিয়েছেন বলে এক বছরের মাথায় আফিয়ার অ এবং মহলের ম উঠে গেল।

এখন আমাদের বাড়ির নাম—

ফিয়া হল

যেদিন বাড়িতে শ্বেতপাথরের নাম লাগানো হলো সেদিন বাবা কাঁপা কাঁপা গলায় ঘোষণা করলেন, সম্রাট শাহজাহান তাজমহল বানিয়ে ছিলেন, আমি বানালাম আফিয়া মহল। ইনশাল্লাহ আমি আগামী দুই এক বছরের মধ্যে তিন তলাটা কমপ্লিট করে দেব। তিনতলার আলাদা নাম হবে—

আফিয়া আলয়

পুরা তিনতলা হবে আফিয়ার একার সংসার। তার শোবার ঘর, তার বসার ঘর, সাজের ঘর এবং নামাজ ঘর। আফিয়ার অনুমতি ছাড়া তিনতলায় কেউ যেতে পারবে না। এমনকি আমি যদি যাই আমারও অনুমতি লাগবে।

বাবার কথাবার্তায় আমাদের হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু মা কেঁদে কেটে অস্থির।

বাড়ি দোতলা পর্যন্ত হবার পর বাবা মানত রক্ষার জন্যে মাকে নিয়ে আজমির শরিফ গেলেন। পথে দিল্লিতে তারা তাজমহল দেখলেন। তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে ফটোগ্রাফারদের দিয়ে ছবি তুললেন। সেই ছবিও অনেক কায়দার ছবি। দুজন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছেন। দুজনের হাতের ফাঁক দিয়ে তাজমহল দেখা যাচ্ছে। এই ছবি বাঁধাই করে আমাদের বসার ঘরে টিভির পাশে ঝুলানো হলো।

সেই ছবিটা গতকাল সকালে সরানো হয়েছে। শুধু এই ছবি না, বাবার সব ছবিই নামানো হয়েছে। মা'র ঘরে বাবার তিনটা ছবি ছিল। তিনি ব্যবসার জন্যে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন, তখন তোলা ছবি। প্রতিটি ছবিতে তাঁর চোখে কালো চশমা ঠোঁটে পাইপ।

মা'র ঘরে বিশেষ ভঙ্গিমায় তোলা এই ছবিগুলি শুধু যে নামানো হলো তা-না, কাজের মেয়েকে বলা হয়েছে শিল-পাটার শিল দিয়ে ছবির কাচগুলি ভাঙতে। সে কাচ ভাঙতে গিয়ে নিজের হাতও কেটেছে। এমনই কেটেছে যে ডাক্তারের কাছে নিয়ে স্টিচও করাতে হয়েছে।

বাবার বিষয়ে ভাইয়া এবং মা মিলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা হলো—

১. এই বদলোক কখনো বাড়িতে ঢুকতে পারবে না।
২. এই বদের নাম বাড়িতে কেউ উচ্চারণ করতে পারবে না।
৩. বদটার নামে স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই দ্বিতীয় বিবাহ এবং নারী নির্যাতন আইনে মামলা করা হবে। [মামলা করা হয়ে গেছে।]
৪. বদটাকে জেলের ভাত খেতে হবে।

মা'র পক্ষে যে উকিল মামলা পরিচালনা করছেন তাঁর নাম মোহম্মদ কায়েস উদ্দিন তালুকদার। এই কায়েস উদ্দিন সাহেবের হাবভাব চোরের মতো। তিনি স্থির হয়ে কারো দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে পারেন না। সারাক্ষণ এদিক-ওদিক করেন। তাঁর মুদ্রাদোষ হচ্ছে প্রতিটি কথার আগে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বলবেন— 'এখন তাহলে একটা কথা বলি ?'

তালুকদার সাহেব মাকে বললেন— এখন তাহলে একটা কথা বলি ? ভাবি সাহেব শুনেন, আমি যদি আপনার স্বামীকে সাত বছর জেলখানার লাবড়া না খাওয়াতে পারি তাহলে আমি বাকি জীবন ভাত খাব না। পাঞ্জাবিদের মতো রুটি খাব। বড়বোন হিসেবে আপনার কাছে এই আমার ওয়াদা।

মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, আপনার স্বামী আপনার স্বামী করছেন কেন ? সে কি আমার স্বামী ?

তালুকদার সাহেব বললেন, এখন তাহলে একটা কথা বলি ? উনি এখনো আপনার স্বামী। আপনি ডিভোর্স করলে স্বামী থাকবে না। তবে এখন ডিভোর্স করা ঠিক হবে না। মামলা দুর্বল হয়ে যাবে।

মা বললেন, মামলা দুর্বল হয় এমন কিছুই আমি করব না। ঐ বদটা সারাজীবনের জন্যে জেলে থাকতে পারে কি-না সেটা দেখেন।

আপা, সেটা সম্ভব হবে না। সাত বছরের বেশি আমি পারব না। ঐ গ্যারান্টি আপনাকে আমি দিচ্ছি। আমি গ্যারান্টি দিয়ে মামলা চালাই। বিনা গ্যারান্টিতে মোহম্মদ কায়েস উদ্দিন তালুকদার মামলা নেয় না।

বাবার মতো ঘড়েল লোক তালুকদারের প্যাঁচে পড়ে সাত বছরের জন্যে জেলে যাবেন লাবড়া খেতে, এটা আমার কখনোই মনে হয় নি। মামলার প্রথম তারিখেই আমার সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হলো। মা যে বাবাকে অনেক আগেই দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন সেই কাগজ (নোটারি পাবলিক দিয়ে

নোটিফাই করানো। সঙ্গে ওয়ার্ড কমিশনারের কাগজ, যে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতির বিষয়টি তাঁর জানা আছে) জমা দিলেন।

আমাদের উকিল সাহেব মাকে বললেন, তাহলে একটা কথা বলি ? আপনার দুষ্ট হ্যাসবেন্ড যে এরকম একটা স্টেপ নিবে তা আমার হিসাবের মধ্যে আছে। সব রোগের যেমন চিকিৎসা আছে, এই রোগেরও চিকিৎসা আছে। দেখেন কী করি ?

মা বললেন, কী করবেন ?

মামলার কাগজপত্রের নকল নিয়ে এসেছি। আপনার সই জাল করা হয়েছে এটা প্রমাণ করব, ওয়ার্ড কমিশনারের চিঠিও যে জাল তাও প্রমাণ করব। এতে আমাদের মামলা আরো শক্ত হবে— সাত বছরের জায়গায় আট-ন বছরের বাসস্থান উনার জোগাড় হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।

মা কোর্টের কাগজপত্র দেখে শুকনা মুখে বললেন, সই তো জাল না। সই আমার।

কখন সই করলেন ?

কখন সই করেছি মনে নাই। তবে সাদা কাগজে সই করেছি। ঐ বদ নানান সময়ে কাগজপত্রে আমার সই নিয়েছে। এই বাড়ি তো আমার নামে, বাড়ির ট্যাক্স দিতে হবে, হেনতেন বলে সই করিয়েছে।

আপা, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। এই হিসাবও আমার আছে। আমি বিনা হিসাবে কাজ করি না। একজন সাধারণ মানুষ ঘুঘু দেখলে ফাঁদ দেখে না। ফাঁদ দেখলে ঘুঘু দেখে না। আমি আপনাদের দশজনের দোয়ায় দুটাই একসঙ্গে দেখি। ব্যবস্থা নিচ্ছি।

কী ব্যবস্থা ?

যথাসময়ে জানবেন। প্রথমে যেটা দেখতে হবে— বাড়িঘর এখনো আপনার নামে আছে, না-কি এখানেও কিছু দুই নম্বরি করা হয়েছে। এক সপ্তাহের ভেতর আপনি বাড়িঘরের ট্রু পিকচার পাবেন। এখন আপনাকে একটা কথা বলি, ধৈর্য ধরুন।

বদটা জেলে যাবে তো ?

অবশ্যই।

সাত বছর ?

মিনিমাম সাত। বেশিও হতে পারে। আপাতত জেলের চিন্তা মাথা থেকে দূর করতে হবে। প্রায়োরিটি বেসিসে কাজ করতে হবে। বাড়িঘর ঠিক আছে কি-না আগে দেখতে হবে। প্রায়োরিটি লিস্টে এটা নাম্বার ওয়ান।

এক সপ্তাহের মধ্যে জানা গেল, বাড়িঘর ঠিক ঠাক আছে। আফিয়া মহল মা'র নামেই আছে। তাঁর নামেই নাম জারি করা হয়েছে। মিউনিসিপ্যালটি ট্যাক্সও তাঁর নামেই দেয়া হচ্ছে।

বাবার সাম্প্রতিক খবরে বিন্দুমাত্র বিচলিত যিনি হলেন না, তিনি বড়খালা— মাজেদা বেগম। তিনি বিচলিত লোডশেডিং নিয়ে। আমার সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর দীর্ঘ আলাপ হয়। তিনি হতাশ গলায় বলেন, এটা কী অবস্থারে বাবলু ? এক ঘণ্টা কারেন্ট না থাকা সহ্য করা যায়— দেড় ঘণ্টা দু'ঘণ্টা এসি ছাড়া মানুষ বাঁচবে কীভাবে ?

ঠিকই বলেছ, এসি ওয়ালাদের বিরাট দুর্ভোগ।

ভোল্টেজ কী রকম উঠানামা করে দেখেছিস ? যে-কোনোদিন কম্প্রেসার জ্বলে যাবে। তখন উপায় কী হবে ?

আরেকটা এসি কিনবে। তোমার তো টাকার অভাব নেই।

সেইটা যখন জ্বলে যাবে তখন ?

তখন আরেকটা।

উন্মাদের মতো কথা বলিস না তো বাবলু। তোর কথাবার্তা বদ্ধ উন্মাদের মতো। আমি একটার পর একটা কিনতেই থাকব ? তুই আছিস নিজেকে নিয়ে। অন্যের দুঃখ-কষ্ট তোর মাথায় ঢোকে না। পরশু রাতে কী হয়েছে জানিস ?

না। বলো।

রাতে আরাম করে ঘুমাচ্ছি। ঘর ঠাণ্ডা। এসি চলছে। হঠাৎ স্বপ্নে দেখলাম, এসিটা বার্স্ট হয়েছে। সেখানে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আমি ঘর থেকে বের হতে গেলাম, দেখি আমার প্যারালিসিসের মতো হয়েছে, বিছানা থেকে নামতে পারা দূরের কথা, শোয়া থেকে উঠে বসতেও পারছি না। এদিকে এসির আগুন বাড়ছে। গায়ে আগুনের আঁচ লাগছে। শরীর পুড়ে যাচ্ছে। তখন ঘুম ভাঙল। দেখি এসি বন্ধ। লোডশেডিং না কী যেন হয়েছে কে জানে! ঘরের ভেতরে অসহ্য গরম। আমি মাথায় পানি ঢাললাম, সারা গায়ে পানি ঢাললাম, বিছানায় পানি ঢাললাম, তাতেও গরম কমে না। কারেন্ট এলো ভোর চারটা তেইশ মিনিটে, তখন ঘুমাতে গেলাম। বুঝলি অবস্থা ?

তোমার জন্যে অবস্থা যে খারাপ এটা বুঝতে পারছি।

তুই এসির লোককে খবর দে তো। সার্ভিসিং করে দিক।

গত মাসে তো একবার সার্ভিসিং করল।

আরেকবার করুক। সার্ভিসিং যত করবি তত ভালো।

আচ্ছা খবর দেব।

এখন তুই ঘর থেকে যা, আমার গরম বেশি লাগছে। গায়ের কাপড়-চোপড় খুলে গায়ে এসির ঠাণ্ডা বাতাস মাখব। বনের পশুরা কী আরামে থাকে, একবার ভেবেছিস ? কাপড় পরতে হয় না...

বাবার বিষয় নিয়ে আরো একজন নির্বিকার। তিনি নীলা ফুপু। বাসায় কী হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে ফুপুর মাথাব্যথা নেই। তাঁর ধ্যান-স্বপ্ন প্যাকেজ নাটক। পরিচালক মুকুল ভাই, নাটকের লোকজন অভিনেতা, অভিনেত্রী, ক্যামেরাম্যান, মেকাপম্যান, লাইটম্যান। বাসায় তিনি যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ তাঁর হাতে মোবাইল টেলিফোন থাকে। তিনি হাঁটতে হাঁটতে নাটকের সঙ্গে যুক্ত কারো না কারো সঙ্গে গল্প করেন।

'কে, মারুফ ভাই ? শট দিচ্ছেন ? তাহলে পরে টেলিফোন করব। কার নাটক ? ও বিশু ভাইয়ের ? মেগা সিরিয়েল না-কি সিঙ্গেল ? মেগা ? বিশু ভাইকে বলেন না, আমাকে কোথাও ঢুকিয়ে দিতে। আমি ফ্রি আছি।'

'লুনা আপু! খবর পেয়েছি ঐদিন আপনি খুব মজা করে জন্মদিন করেছেন। আমার কথা তো মনে পড়ল না। আপনার জন্যে একটা গিফট রেখে দিয়েছি— ফেস ওয়াশ। বেলজিয়ামের তৈরি। কৌটাটা খুব কিউট। আমি এসে বাসায় দিয়ে যাব। কবে আসব বলুন।'

'হ্যালো, কে, ফরিদ ভাই ? ভালো আছেন ফরিদ ভাই ? ভাবি ভালো আছেন ? আপনার মেয়েটার যে হাম হয়েছিল, হাম কমেছে ? ছোটবেলায় আমার একবার হয়েছিল, যা কষ্ট দেয়। একটু কাজের কথা বলি ফরিদ ভাই ? আপনারা আমাকে যে রোলটা দিয়েছেন সেটা না-কি আমার আগে আরো দুজনকে আপনারা অফার দিয়েছেন। তারা রিজেক্ট করেছে। সেই রোল আমাকে দিয়েছেন। যাদের অফার করেছেন তারাই আমাকে বলেছে। আচ্ছা ফরিদ ভাই, আমি কি এতই ফেলনা ? হ্যাঁ, আমি করব। করব না কেন ? আপনাদের পার্টির সঙ্গে আমার সম্পর্ক আলাদা। আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলির মতো, তাই না ? ফরিদ ভাই, আমি একদিন আপনাদের বাসায় যাব। ভাবির সঙ্গে গল্প করব আর আপনার মেয়েটাকে দেখে আসব। আপনার মেয়েটা কী যে সুইট হয়েছে ফরিদ ভাই। আপনার মেয়ের জন্যে আমি এক প্যাকেট চকলেট আলাদা করে রেখেছি। সুইজারল্যান্ডের চকলেট। টিনের ভেতর থাকে।'

নীলা ফুপুর সঙ্গে গত বুধবারে আমি শুটিং দেখতে গিয়েছিলাম। ফুপু আমাকে জোর করে নিয়ে গেল। নায়কের সঙ্গে তাঁর না-কি সিরিয়াস অ্যাকটিং আছে। দেখার মতো জিনিস হবে।

আমি বললাম, তুমি নায়িকা না-কি ?

না, আমি নায়িকা না। নতুন একটা মেয়ে নায়িকা। অভিনয়ের অ জানে না। চেহারাও বান্দরীর মতো। প্রডিউসারের সাথে ইটিস-পিটিশ আছে, এইজন্যে তাকে নিয়েছে।

তুমি তাহলে নায়কের সঙ্গে কী করবে ?

সিকোয়েন্সটা তোকে বলি। পার্কের সিকোয়েন্স। আমি একটা গাছে হেলান দিয়ে বাদাম খাচ্ছি, এমন সময় নায়ক রিয়াজ ভাই আসবে। আমাকে দূর থেকে দেখে মনে করবে, আমিই তার নায়িকা। রিয়াজ ভাই পা টিপে টিপে এসে আমার পাশে বসবে, মাথায় টোকা দেবে। আমি চমকে রিয়াজ ভাইয়ের দিকে তাকাব। রিয়াজ ভাই বলবেন, Sorry, I made a mistake. তারপর উঠে চলে যাবেন।

তোমার কী ডায়ালগ ?

আমার কোনো ডায়ালগ নেই। ক্লোজ ট্রিটমেন্টের সিকোয়েন্স তো। এইসব সিকোয়েন্সে ডায়ালগ দিলে সিকোয়েন্স পড়ে যায়। এইসব সিকোয়েন্স হলো এক্সপ্রেশনের খেলা।

তুমি কী এক্সপ্রেশন দেবে ?

আমার সঙ্গে চল। নিজের চোখে দেখবি। এই ধরনের সিকোয়েন্স দেখার মধ্যেও মজা আছে। নানান দিক থেকে লাইট করবে। ব্যাক লাইট দিবে। ব্যাক লাইট কি জানিস ?

না।

পেছন থেকে যে লাইট দেয় তাকে বলে ব্যাক লাইট। ব্যাক লাইট দিলে চেহারা ফুটে উঠে। আমার পেছনে যখন ব্যাক লাইট দিবে তখন দেখবি চেহারা কেমন বদলে যায়। আমাকে রাজকন্যার মতো লাগবে।

নীলা ফুপুর অভিনয় দেখতে না যাওয়াই ভালো ছিল। পরিচালক সাহেব (মুকুল ভাই না, অন্য একজন) এমন ধমক শুরু করলেন। ধমকের ভাষাও খারাপ— এই গাধী মেয়েকে কে এনেছে ? হাত-পা শক্ত করে বসে আছে! কেউ একজন এর গালে একটা থাপ্পড় দাও তো। এই মেয়ে, তুমি আগে আগে মাথা ঘোরাও কেন ? আবার যদি আগে আগে মাথা ঘোরাও— ঘাড় মটকে দেব। গাধীর গাধী!

পরিচালক সাহেবকে আমি দোষ দিতে পারি না। নীলা ফুপু আসলেই কিছু পারছে না। অ্যাকশান বলার আগপর্যন্ত ঠিক আছে। অ্যাকশান বলার পরপরই

উনার হাত-পা-মুখ সব শক্ত। নিঃশ্বাসও বন্ধ। জীবন্ত মানুষ থেকে হঠাৎ তিনি মূর্তি হয়ে যাচ্ছেন। নায়ক তাঁর পেছনে দাঁড়ানো মাত্রই তিনি আড়চোখে তাকাবেন। তাকিয়ে শরীরে ছোট্ট ঝাঁকি দেবেন।

শেষপর্যন্ত টেক ওকে হলো। তবে পরিচালকের মন মতো হলো না। তিনি তাঁর অ্যাসিসটেন্টকে বললেন, এই গাধীকে আবার যদি কল দিয়ে আনো, তোমাকে আমি কানে ধরে উঠবোস করাব। ত্রিশ সেকেন্ডের সিকোয়েন্সে একঘণ্টা খেয়ে ফেলেছে।

নীলা ফুপু বেশ স্বাভাবিক। যেন কিছুই হয় নি। তিনি তার নিজের জন্যে এবং আমার জন্যে দু'কাপ চা নিয়ে নিলেন। চাপা গলায় বললেন, প্রডাকশনের লেবু চা, খেয়ে দেখ মজা পাবি। দুপুরে এফডিসি'র খানা আসবে। মিনিমাম দশ পদের ভর্তা থাকবে। সঙ্গে মাছ গোশত। মাছ গোশত দু'টাই কেউ পাবে না। যারা গোশত নিবে তারা মাছ পাবে না। শুধু ডিরেক্টর সাহেব এবং নায়ক-নায়িকা মাছ-গোশত দু'পদই পাবে। এটাই নিয়ম। দুপুর পর্যন্ত থাক, খেয়ে যা।

আমি বললাম, তোমার কি আরো সিকোয়েন্স আছে?

আর নেই। তবু থাকতে হয়। একটা ইউনিটের সঙ্গে আছি, কাজ নেই বলে চলে যাওয়া তো ঠিক না।

তুমি বরং চলেই যাও। ডিরেক্টর সাহেব যেমন রেগেছেন। তোমাকে মারবেন।

তুই কী যে বলিস! 'টেক'-এর সময় উনি সবাইকে ধমকা ধমকি করেন। সিকোয়েন্স শেষ হয়ে গেলে আবার মাটির মানুষ। সবার সঙ্গে হাসি খুশি। জোক বলছেন, মজা করছেন। আয় তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই।

কোনো দরকার নেই।

দরকার আছে। তোর ধারণা হয়েছে, উনি আমার ওপর রেগে আছেন। ধারণাটা কত ভুল এক্ষুনি প্রমাণ পাবি।

আমার প্রমাণের দরকার নেই।

আয় তো।

নীলা ফুপু আমার হাত ধরে প্রায় টেনেই ডিরেক্টর সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি মুখভর্তি করে পান খাচ্ছিলেন। এক হাতে আবার চায়ের কাপ। পান এবং চা কি একসঙ্গেই খাচ্ছেন? অসম্ভব না। এরা তো আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষ না।

স্যার, এ আমার ভাইয়ের ছেলে। এর নাম বাবলু।

ডিরেক্টর সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি বিনীতভাবে বললাম, স্যার, স্লামালিকুম। ডিরেক্টর সাহেব সালামের জবাব না দিয়ে নীলা ফুপুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কাজ শেষ না?

নীলা ফুপু বললেন, জি স্যার।

তাহলে এখনো ঘুরঘুর করছ কেন? বাড়ি যাচ্ছ না কেন?

আমরা ট্যাক্সি ক্যাবে ফিরছি। ট্যাক্সিতে উঠে নীলা ফুপু সামান্য কান্নাকাটি করলেও এখন স্বাভাবিক। শাহবাগের কাছে এসে আমাকে বললেন, তুই এখানে নেমে যা। আমি একটু মুকুল ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। দশটা টাকা রাখ, রিকশা ভাড়া।

দশ টাকা বলে যে নোটটা তিনি আমার হাতে গুঁজে দিয়েছেন সেটা একটা একশ' টাকার নোট। আমি বললাম, ফুপু, তুমি ভুলে একশ' টাকার নোট দিয়েছ।

ফুপু বললেন, দিয়েছি যখন রেখে দে।

ফেরত দিতে হবে না?

তুই কি গাধা নাকি?

ট্যাক্সি থেকে নেমে হঠাৎ করে মনে হলো, আমি আমার এই ফুপুকে খুবই পছন্দ করি। কেন করি? উনি বোকা বলে কি পছন্দ করি? বুদ্ধিমান মানুষদের কেউ পছন্দ করে না। মানুষ পছন্দ করে বোকাদের। তবে বড়খালাকে আমি কেন পছন্দ করি না? উনি তো যথেষ্টই বোকা। এদিকে জহির ভাইকে আমার বেশ পছন্দ। জহির ভাই অসম্ভব বুদ্ধিমান। তাহলে কি এই দাঁড়াচ্ছে না যে, মানুষ বোকাদের পছন্দ করে, এই থিওরি ভুল?

নীলা ফুপু মাঝে মধ্যেই পাঁচটা টাকা রাখ বলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দেন কিংবা দশটা টাকা রাখ বলে একটা একশ' টাকার নোট দেন। এই কারণেই কি উনাকে পছন্দ করি? পছন্দটা কি অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত? তাও তো ঠিক না। জহির ভাই কখনো আমাকে টাকা-পয়সা দেন না। তারপরেও তো তাঁকে আমার খুবই পছন্দ।

জহির ভাই টাকা-পয়সা দেন না, তার মূল কারণ অবশ্যি উনার কাছে টাকা-পয়সা নেই। উনি নিজেই চলেন এর তার কাছে হাত পেতে। এখন অবশ্যি তাঁর অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে তিনি 'দি ইমেজ'-এ স্থায়ী হয়েছেন। ভালোভাবেই স্থায়ী হয়েছেন। ফারুক ভাইয়ের স্ত্রী (নাসরিন,

দেখতে শাকচুন্নির মতো। দাঁত ভাসা, চুলের রঙ প্রায় লাল) না-কি জহির ভাইকে অনুরোধ করেছেন মৃত বন্ধুর ব্যবসা দেখাশোনা করতে। তাঁর বিশ্বাসী কেউ নেই। জহির ভাই ভরসা। জহির ভাই রাজি হয়েছেন। এখন তিনিই ভিডিও ব্যবসা দেখেন। শাকচুন্নি মহিলাকে আগে কখনো দি ইমেজে দেখা যায় নি। এখন তিনি প্রায়ই আসেন। বিহারি মেয়েদের মতো ঝলমলা শাড়ি পরেন। গালে কী যেন মাখেন— এতে গাল আপেলের মতো লাল টুকটুক হয়ে যায়। তারপরেও এই মহিলার দিকে তাকানো যায় না। ভিডিও দোকানের স্টাফরা আড়ালে তাকে দু'টা নামে ডাকে। এক, ঘোড়ামুখী। এই নামকরণ ঠিক আছে। সাইড থেকে দেখলে তাঁর মুখের সঙ্গে ঘোড়ার মুখের মিল আছে। তবে তাঁর আরেকটা নাম হলো শিয়ালমুত্রা। এই নামের পেছনের কারণ কী জানি না। কোনো একদিন জিজ্ঞেস করে জেনে নিব।

শিয়ালমুত্রার সঙ্গে একদিনই আমার কথা হয়েছে। উনি আমাকে দেখে বললেন, তুমি জহির সাহেবের ভাই না ? সারাদিন তোমাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখি, স্কুলে যাও না ?

স্কুল বন্ধ।

এখন কিসের স্কুল বন্ধ ? বাংলাদেশের সব স্কুল খোলা, তোমারটা বন্ধ— এর মানে কী ? আমার সঙ্গে বাইচলামি কর ?

এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি তো, এই জন্যে স্কুল বন্ধ।

ও আচ্ছা তাই বলো। তুমি কি এখান থেকে ভিডিও নিয়ে যাও ?

জি।

তুমি দেখ, না আর কেউ দেখে ?

আমার বড়খালা দেখেন।

এক্স রেটেড ছবি নাও না তো ? ঐ যে ছেলেমেয়ের কুকর্মের ছবি ?

জি-না।

আমি কিন্তু রেজিস্টার চেক করে দেখব। যদি দেখি ট্রিপল এক্স বা ডাবল এক্স ছবি নিয়েছ— তাহলে কিন্তু তোমার খবর আছে। তোমার বাসায় কমপ্লেইন করা হবে। বুঝেছ তো ?

জি।

আরেকটা কথা তোমাকে বলব। এই কথাটা উঁচাগলায় বলতে পারব না। চাপাগলায় বলব। আমি চাই না বাইরের কেউ শুনুক।

আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। শিয়ালমুত্রা ফিসফিস করে বললেন, এতক্ষণ ধরে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, তুমি আমার চোখের দিকে তাকাও নাই। তাকিয়ে ছিলে আমার বুকের দিকে। সেই দিনের বাচ্চাছেলে, মুখের দুধের গন্ধ এখনো যায় নাই, এর মধ্যেই মেয়েছেলের বুকের দিকে তাকিয়ে থাকা শিখেছ। যাও সামনে থেকে।

আমি ভদ্রমহিলার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম না, এটা ঠিক। তবে আমি তাঁর বুকের দিকেও তাকিয়ে ছিলাম না। আমি তাকিয়ে ছিলাম তাঁর দাঁতের দিকে।

জহির ভাইয়ের সঙ্গে এই মহিলার সম্পর্ক কোন পর্যায়ের আমি এখনো জানি না। জহির ভাই তাকে ডাকেন রুবি। মনে হয় রুবি এই মহিলার ডাকনাম।

একদিন জহির ভাইয়ের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, 'দি ইমেজ'-এর ম্যানেজার কাদের সাহের গম্ভীর গলায় বললেন, বাবলু, এখন যেও না। ম্যাডাম জহির ভাইয়ের সঙ্গে আছেন। ঘণ্টাখানিক পরে এসো।

বলতে ভুলে গেছি, কাদের সাহেবকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও পরে ছেড়ে দিয়েছে। পুলিশের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত হয়েছে। কিছু টাকা খরচ হয়েছে, তার পরিমাণও অল্প।

কাদের সাহেব লোক ভালো। গাট্টাগোট্টা চেহারা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তাকে দেখলেই মনে হয় ফুটবল কোচ বা এই ধরনের কেউ। তিনি সব সময় ভুরু কুঁচকে রাখেন। মনে হয় গভীর কোনো চিন্তার মধ্যে থাকেন। তিনি কারো সঙ্গেই বিশেষ কথাবার্তা বলেন না— তবে আমার সঙ্গে মাঝে মধ্যে কথা বলেন।

জহির ভাইয়ের ঘরের সামনে থেকে ফিরছি, কাদের সাহেব বললেন, বাবলু, কোক ফান্টা এইসব কিছু খাবে ?

আমি বললাম, জি-না।

তোমাদের রেজাল্ট কবে হবে ?

এখনো জানি না।

আমি শুনলাম তুমিও তোমার বড়ভাইয়ের মতো ভালো ছাত্র, সত্যি না-কি ? তুমিও তো ফার্স্ট সেকেন্ড হবে ?

এখন তো কেউ আর ফার্স্ট সেকেন্ড হয় না। এখন গ্রেডিং হয়।

তা ঠিক, খুবই বাজে সিস্টেম। ফার্স্ট সেকেন্ড হলে ছবি ছাপা হয় পত্রিকায়। ছবি দেখে অন্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কম্পিটিশনের ভাব আসে। ঠিক না ?

জি।

ফার্স্ট সেকেন্ড হওয়া ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাবা-মা'র ছবিও ছাপা হয়। এতে বাবা-মা'দের মনে আনন্দ হয়। তাদের আনন্দেরও তো প্রয়োজন আছে। আছে না?

জি।

তোমার বাবার বিষয়ে উড়াউড়া কিছু খবর শুনি। সেটা সত্যি?

জি সত্যি।

ভেরি স্যাড। পিতামাতা হলো সন্তানের আদর্শ। সেই পিতামাতা যদি এরকম করে— তাহলে সন্তান আর কী করবে? যাই হোক, মন খারাপ করবে না। পিতামাতা যা ইচ্ছা করুক, তুমি তোমার কাজ করে যাবে। তোমার কাজ পিতামাতাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা। ঠিক বলেছি না?

জি।

আইসক্রিম খাবে? একটা আইসক্রিম আনিয়ে দেই?

জি-না।

আচ্ছা যাও। ফি আমানিল্লাহ। তোমার জহির ভাইয়ের সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন থাকলে পরে আরেকবার এসো।

জি আচ্ছা।



আমার নামে কখনো কোনো চিঠি আসে না। কে আমাকে চিঠি লিখবে? যারা লেখার তারা তো আশেপাশেই আছে। তারপরেও আশ্চর্য, পোস্টাপিসের পিওন এসেছে আমার খোঁজে। সে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি নিয়ে এসেছে। রেজিস্ট্রি উইথ অ্যাকনলেজমেন্ট। দস্তখত করে চিঠি নিতে হবে। রেজিস্ট্রি করা চিঠি আমাকে কে লিখবে? খামের লেখাও অপরিচিত। খাম খুলে দেখি বাবার দীর্ঘ চিঠি।

My dear Sun,

তোমাকে Son না বলিয়া Sun বলিলাম। এই Sun-এর অর্থ সূর্য, দিবাকর। তুমি আমার নিকট দিবাকর।

বাবা, তুমি কেমন আছ? দীর্ঘদিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেছে না। বিগত পাঁচ তারিখে তোমাদের বাসার সম্মুখ দিয়া বেশ কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করিয়াছি। পরিকল্পনা ছিল তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তোমাকে নিয়া একসঙ্গে কিছুক্ষণ বসিতাম। দুর্ভাগ্য তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে ঠিক করিলাম নীলার মোবাইল নাম্বারে টেলিফোন করিয়া সংবাদ নেই। তাহার টেলিফোন নাম্বার হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া ইহাও সম্ভব হয় নাই।

বাসার সংবাদ কী? তোমার মাতা আমার বিরুদ্ধে মামলা করিয়াছে। এই সংবাদ নিশ্চয়ই পাইয়াছ। মামলার ফলাফল তোমার মাতার জন্য শুভ হইবে না। কিন্তু ইহা তাহাকে কে বুঝাইবে? মিলমিশ করিয়া থাকাতে যে আনন্দ সেই আনন্দ অন্য কোথাও নাই। তোমার মাতার সহিত একান্তে বসিয়া কিছু কথা বলিতে পারিলে সমস্যার সুরাহা হইবার সম্ভাবনা আছে। কীভাবে একান্তে বসা যায় তা নিয়া আমি ভাবিতেছি। মাথায় তেমন কোনো পরিকল্পনা আসিতেছে না।

মালতীর ইচ্ছা সে একদিন তাহার শিশু সন্তানকে কোলে নিয়া তোমার মাতার কাছে যাইবে। এবং তোমার মাতার পা জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকিবে। এই বুদ্ধিও খারাপ না। স্ত্রীলোকের মাথায় মাঝে মধ্যে ভালো বুদ্ধি খেলা করে। স্ত্রীলোকেরা পা ধরাধরির বিষয়টাও পছন্দ করে। মালতী যদি এক পা জড়াইয়া ধরে এবং যূথী যদি অন্য পা জড়াইয়া ধরে, (যূথীকে শিখাইয়া পড়াইয়া নিলে সে এই কাজ অবশ্যই করিবে) তাহা হইলে তোমার মাতার হৃদয় নরম হইবার সম্ভাবনা আছে। তোমার কী ধারণা ? সাক্ষাতে আমরা এইসব নিয়া আলাপ করিব। বাবা, তুমি একবার আস।

আগামী ১৭ তারিখ সন্ধ্যায় যূথীর চতুর্থ জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হইবে। ইহা তাহার মায়ের ইচ্ছা। তোমার পক্ষে কি এই দিন আসা সম্ভব ? উৎসব তেমন কিছু না। উন্নত মানের খাদ্য কেক মিষ্টি ইত্যাদি। আমার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না। বড় কিছু করা সম্ভব না। সঞ্চিত টাকা-পয়সা একত্র করিয়া তোমার মায়ের নামে দুইটি এফডিআর করাইয়া দিয়াছিলাম। একটি এফডিআর চলতি মাসের ১১ তারিখে ম্যাচিউরড হইয়াছে। তোমার মাতা এই এফডিআর হইতে দশ লক্ষ টাকা পাইবেন। এই অর্থের কিছু আমাকে দিলে আমার উপকার হইত। তোমার মাতাকে যে এই বিষয়ে অনুরোধ করিব সেই সুযোগও পাইতেছি না। আল্লাহ পাকের উপর ভরসা। দেখি উনি আমার জন্য কী ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

বাবা বাবলু, পত্রপাঠ সম্পন্ন হইবা মাত্র ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিয়া ফেলিবে। এই পত্র তোমার মায়ের হাতে পড়িলে বিপদের সম্ভাবনা।

দোয়াগো
তোমার হতভাগ্য পিতা
তোফাজ্জল হোসেন

সতেরো তারিখ সন্ধ্যায় আমি যূথীর জন্মদিন পালন করতে গেলাম। যূথীর জন্য এক প্যাকেট চকলেট এবং একটা হাতি কিনলাম। যূথী তার পছন্দের একটা হাতির কথা বলছিল, এইটাই সেই হাতি কি-না কে জানে।

দরজার কড়া নাড়তেই মালতী দরজা খুলে দিলেন। এই মহিলাকে মালতী ডাকাটা ঠিক হচ্ছে না। ছোট মা ডাকলে মানাতো ভালো হতো। তাও পারছি না।

মালতী দরজা খুলে একপাশে সরে গিয়ে নিচু গলায় বললেন, কেমন আছ বাবা ?

আমার মনে হয় তিনি যে এই বাক্যটি বললেন তা আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন। বাক্যটা বললেন যন্ত্রের মতো গলায়। বলেই মাথাও নিচু করে ফেললেন। আমি বললাম, ভালো আছি।

তুমি যূথীর সঙ্গে গল্প কর। তোমার বাবা ঘুমাচ্ছেন।

অসময়ে ঘুমাচ্ছেন কেন ?

উনার জ্বর।

জ্বর কি বেশি ?

বেশি। পাঁচদিন ধরে জ্বর। ডাক্তারের কাছে যেতে বলি— যায় না। আমার মনে হয় ডেঙ্গু হয়েছে। শরীর ফুলে ফুলে গেছে। তার মাথায়ও যন্ত্রণা। ডেঙ্গু হলে মাথায় যন্ত্রণা হয়। বাবা, তোমাকে একটু চা করে দেই, চা খাবে ?

খাব।

জন্মদিনের কোনো আয়োজন করতে পারি নাই। উনি অসুস্থ, বাজার কে করবে! শুধু পুডিং করেছি। কেক আনা হয়েছে। তোমার বাবা ঘুম থেকে উঠলে কেক কাটা হবে।

জি ঠিক আছে।

তিনি রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। আমি বসলাম যূথীর পাশে। জন্মদিন উপলক্ষে যূথীকে নতুন ফ্রক পরানো হয়েছে। বেণি করে চুল বাঁধা হয়েছে। আগের দিনের মতোই যূথী দুনিয়ার খেলনা নিয়ে বসেছে। আমি বললাম, যূথী, তুমি কি আমাকে চিনেছ ?

যূথী হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

বলো তো আমি কে ?

বাবলু।

হয়েছে। তোমার অনেক বুদ্ধি।

আজ আমার জন্মদিন। তুমি জানো ?

জানি। তোমার জন্য গিফট নিয়ে এসেছি।

কী গিফট ?

কেক কাটা হোক। তারপর তোমাকে দেব।

আচ্ছা। জিতুর মা চলে গেছে, তুমি জানো ?

না। চলে গেছে না-কি ?

হুঁ। মা'র গয়না আর বাবার মানিব্যাগ নিয়ে চলে গেছে। পরশু সকালবেলা গেছে।

বলো কী ?

হুঁ সত্যি কথা। বাবার মানিব্যাগে কত টাকা ছিল তুমি জানো ?

না।

এক হাজার তিনশ' ছাব্বিশ টাকা।

অনেক টাকা ছিল তো!

হুঁ। মা'র কী কী গয়না নিয়েছে তুমি জানো ?

না।

তোমাকে বলব ?

বলো।

দুটা কানের দুল, একটা চেইন, চারটা চুড়ি। মা সারাদিন কেঁদেছে। মার মনে কষ্ট হয়েছে এইজন্য কেঁদেছে। কষ্ট হলে কাঁদতে হয়।

তুমি কাঁদ ?

হুঁ। পেটে ব্যথা হলে কাঁদি। আর যদি খেলনা হারিয়ে যায় তাহলে কাঁদি।

চারটা মোমবাতি জ্বালিয়ে কেক কাটা হলো। সেই কেকের এক টুকরা মুখে দিয়ে বাবা বললেন, অসাধারণ কেক। দি বেস্ট। বলেই বমি করে ঘর ভাসিয়ে ফেললেন।

আমি বললাম, বাবা, তোমার অবস্থা তো খুবই খারাপ।

বাবা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, হুঁ খারাপ।

চোখ টকটকে লাল, ডেঙ্গু হয় নাই তো ?

হতে পারে।

হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছ না কেন ? এখন যাবে ? নিয়ে যাব তোমাকে ?

রুগি নিয়ে গেলেই তো ভর্তি করায় না। ধরাধরি আছে, টাকা-পয়সা খাওয়া খাওয়ি আছে। হাতে টাকা-পয়সা নাই। জিতুর মা মানিব্যাগ নিয়ে পালিয়েছে। মালতীর গয়না নিয়েছে। ক্রিমিন্যাল মেয়ে।

বাবা চল যাই হাসপাতালে। ভর্তি করানো যায় কি-না দেখি।

ঠিক আছি। আমি ঠিক আছি। ঘাম দেবার পর শরীরটা ফর্মে চলে এসেছে। তুই বাসায় চলে যা। বাসায় গিয়ে সাবান ডলে গরম পানি দিয়ে একটা গোসল দিবি। নয়তো দেখা যাবে তোকেও ধরেছে। ভাইরাস মারাত্মক জিনিস, একবার ধরলে জান 'বিলা' করে দেয়।

যূথীর মনে হয় আমার আনা হাতিটা খুব মনে ধরেছে। হাতিটা সে জড়িয়ে বুকের কাছে ধরে রেখেছে। মাঝে মাঝে হাত টান করে সে হাতিটা তার চোখের সামনে আনে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, আবার বুকে চেপে ধরে। আমি বললাম, যূথী, তোমার কি হাতি পছন্দ হয়েছে ? সে প্রশ্নের জবাব দিল না। আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। তার ভুবনে আকাশী রঙের হাতিটা ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি বললাম, যূথী, যাই ? সে শুধু ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল। কিছুই বলল না।

আমার কাছে পনেরশ' টাকা ছিল। হাতির পেছনে নয়শ' টাকা খরচ হয়েছে। এতগুলি টাকা সামান্য একটা তুলা ভরা খেলনার পেছনে খরচ করতে মায়া লাগছিল— এখন ভালো লাগছে। এই বাচ্চামেয়েটি বড় হবে। সে তার সমগ্র জীবনে অসংখ্য উপহার নিশ্চয়ই পাবে, কিন্তু কোনো উপহারই হাতিটার স্থান নিতে পারবে না। এই মেয়েরও একদিন মেয়ে হবে। তার জন্মদিন হবে। জন্মদিনের মেয়েকে তার মা বলবে, আমি যখন তোর মতো ছোট ছিলাম তখন আমি জন্মদিনে একটা হাতি পেয়েছিলাম। পৃথিবীর সবচে' সুন্দর হাতি।

বাচ্চামেয়েটি আগ্রহ করে জানতে চাইবে, কে দিয়েছিল ?

যূথী বলবে, বাবলু দিয়েছিল।

বাবলু কে ?

আমার ভাই। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন।

আচ্ছা আমি কি মেয়েটিকে স্নেহ করি ? হয়তো করি। স্নেহ না করলে এত টাকা দিয়ে হাতি কিনব কেন। আবার এও হতে পারে যে স্নেহ-ট্নেহ কিছু না, আমি ঘটনা দেখতে আসি। বড়খালা ভিডিওতে ঘটনা দেখে মজা পান। আমি বাস্তবের ঘটনায় মজা পাই।



মায়ের উকিল তালুকদার সাহেবের পরামর্শে মা বাবার সঙ্গে একান্তে দেখা করতে রাজি হলেন। তবে মা একা কিছুতেই যাবেন না। সঙ্গে কাউকে না কাউকে যেতে হবে। ঠিক হলো আমি মা'কে নিয়ে যাব। কোথায় যাব সেই জায়গাও ঠিক হলো। ধানমণ্ডিতে জিংলিং নামের একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট। দুপুরবেলা যাওয়া হবে, তখন লোকজন কম থাকে। উকিল সাহেব মা'কে কী বলতে হবে না বলতে হবে সব শিখিয়ে দিলেন। আমার প্রতি নির্দেশ হলো— তারা যখন কথা বলা শুরু করবেন, তখন আমি অন্য টেবিলে চলে যাব। একা একা কোক বা সেভেন আপ খাব।

উকিল সাহেব বললেন, কোন কোন পয়েন্টে কথা বলবেন এইগুলা আমি আলাদা কাগজে লিখে দেই।

মা বললেন, দরকার নেই, আমার মনে থাকবে।

দেখা হওয়ার মানসিক উত্তেজনায় পয়েন্ট বাই পয়েন্ট কথা মনে নাও আসতে পারে।

ঐ লোককে দেখে আমার মানসিক উত্তেজনা হবার কিছু নেই। যা হবে তার নাম রাগ।

রাগের সময় মানুষ বেশি ভুল করে।

আমি ভুল করব না।

চাইনিজ রেস্টুরেন্টের এক কোনায় বাবা বসেছিলেন। অসুখ থেকে উঠায় তাঁকে খুবই কাহিল লাগছে। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেছেন। পাঞ্জাবিটা কুঁচকানো। বাইরে বের হবার সময় বাবা কাপড়-চোপড়ে খুব সাবধান থাকেন। ইস্ত্রি ছাড়া কাপড় পরেন না। আজ মনে হয় ইচ্ছা করেই কুঁচকানো কাপড় পরেছেন। নিজের হতাশ চেহারাটা দেখাতে চাচ্ছেন।

বাবা সিগারেট টানছিলেন। মাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। আধখাওয়া সিগারেট অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিলেন। আমার ধারণা, বাবা এই প্রথম তাঁর স্ত্রীকে দেখে সম্মান করে উঠে দাঁড়ালেন।

বাবা বললেন, কেমন আছ ?

মা জবাব দিলেন না। তিনি বসলেন বাবার মুখোমুখি। আমি বললাম, আমি কি অন্য টেবিলে যাব ?

মা বললেন, যেখানে বসে আছিস সেখানে বসে থাক।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, স্যুপের অর্ডার দেই ? চাইনিজের আসল খাবার স্যুপ। এই একটা জিনিসই এরা বানাতে শিখেছে। বাকি সব অখাদ্য।

আমি বললাম, স্যুপ খাব না বাবা।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, থাক তাহলে স্যুপ বাদ। পানি খেয়ে পেট ভরানোর মানে হয় না। আফিয়া, তুমি কী খাবে বলো ? তুমি তো আবার সেভেন আপ ছাড়া কিছু খাও না। আমি এসেই খোঁজ নিয়েছি। এদের কাছে সেভেন আপ নেই। মিরিন্ডা আছে। জিনিস একই। দিতে বলি একটা মিরিন্ডা ?

মা বললেন, বকবকানিটা বন্ধ করবে ? সারাজীবনই তো বকবক করলে। এখন একটু কম কর।

বাবা চুপ করে গেলেন। মা বললেন, কবে আমি তোমাকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলাম ? তোমার আদরের ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, তার মাথায় হাত রেখে বলো তো কবে দিয়েছি।

বাবা বিড়বিড় করে বললেন, আফিয়া, কাজটা করেছি জানে বাঁচার জন্য। এই বয়সে জেলে ঢুকতে হলে সমস্যা না ? সাদা কাগজে তোমার সিগনেচার করা কয়েকটা পাতা ছিল। ঐটা ব্যবহার করেছি।

আমার দস্তখত করা এমন কাগজ তো তোমার কাছে আরো আছে। আছে না ?

আরো দু'টা আছে।

সেই দুই কাগজ দিয়ে নতুন কোনো প্যাঁচ খেলবে না ?

না না। My word of honour.

মা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা যাই। বাবলু উঠ।

বাবা বললেন, সে-কী! কোনো কথাই তো হয় নি।

মা বললেন, যা হয়েছে যথেষ্ট। বাবলু, এখনো বসে আছিস কী জন্যে ? আয়।

বাবা হড়বড় করে বললেন, এফডিআর একটা ম্যাচিউর হয়েছে। ঐ টাকাটা নিয়ে একটু কথা বলতাম। খুবই খারাপ অবস্থায় আছি। বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে দুই মাসের... আফিয়া শোন...

বাবাকে হতাশ অবস্থায় রেখে আমরা মাতা-পুত্র বের হয়ে এলাম। রিকশা করে ফিরছি, মা চাপা গলায় বললেন, ঐ বদ এখন বুঝবে কত ধানে কত পোলাউয়ের চাল। তার প্রতিটি কথা ডিজিটাল রেকর্ডারে রেকর্ড করা হয়েছে। উকিল সাহেব আমাকে রেকর্ডার দিয়ে দিয়েছিলেন। তোর বাপ পরিষ্কার বলেছে না সাদা কাগজে করা আমার সিগনেচার সে ব্যবহার করেছে। বলেছে না ?

বলেছে।

বলেছে— সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড হয়ে গেছে। অতি চালাকের গলায় দড়ি পড়ে, জানিস তো ? তোর বাপের গলায় দড়ি পড়েছে।

কাজটা কি ঠিক হয়েছে মা ?

তোর বাবা যে কাজটা করেছে সেটা ঠিক, আর আমারটা ভুল ? রিকশা থামতে বল তো।

কেন ?

গলা শুকিয়ে গেছে, একটা সেভেন আপ খাব। ঠাণ্ডা দেখে আনবি। আমার কাছে ভাঙতি টাকা নেই। তোর কাছে ভাঙতি আছে ?

আছে।

ক্যানের সেভেন আপ আনবি। সঙ্গে স্ট্র আনবি।

আমি রিকশা থেকে নেমে গলির ভেতর ঢুকে হাঁটা দিলাম। মা থাকুন গরমের মধ্যে রিকশায় বসে। আমাকে ফেলে চলে যেতে পারবে না। ছেলে সেভেন আপ আনতে গিয়ে কোথায় গেল। তার কোনো বিপদ হলো কি-না। সবচে' ভালো হয় যদি আজ রাত বাসায় না ফিরি। মা তাহলে বুঝবে টেনশন কত প্রকার ও কী কী। মা'র ওপর রাগ লাগছে। তাকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করছে। আমি ছোট্ট মানুষ, আমার শাস্তি দেয়ার ক্ষমতাও ছোট্ট।

কোনো রকম উদ্দেশ্য ছাড়া রাস্তায় হাঁটাহাটি করে সময় পার করা কঠিন ব্যাপার। তখন সময় আটকে যায়। নিজেকে ব্যস্ত রাখাও মুশকিল। দেখার অনেক কিছুই আছে, আবার কিছুই নেই। ঢাকার রাস্তার সব দৃশ্যই অনেকবার দেখা। ঝকঝকে প্রকাণ্ড সব নতুন বাস নেমেছে। এসি বাস। এই বাসের যাত্রীদের দিকে তাকালে মনে হয়, একদল সুখী মানুষ। আরাম করে কোথাও যাচ্ছে। আবার এই যাত্রীরাই যখন ভাঙাচোরা বাসে চড়ে, গরমে ঘামে, খুপড়ি জানালা দিয়ে মুখ বের করে রাখে, তাদেরকে মনে হয় ভয়ানক অসুখী। অতি ব্যস্ত রাস্তায় ঠেলাগাড়ি দেখতে ভালো লাগে। সব ঠেলার সঙ্গে ঠেলাওয়ালার অল্প বয়েসী একটা ছেলে থাকে। সে তার বাবার সাহায্যের জন্যে অতি ব্যস্ত। তার ব্যস্ততাও দেখতে ভালো লাগে। ঢাকার রাস্তায় সবসময় কিছু অতি বৃদ্ধ পাওয়া যায় যাদের একমাত্র কাজ রাস্তা পার হওয়া। রাস্তা খানিকটা পার হয়ে তারা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফিরে আসতে চায়, ফিরতে পারে না। হঠাৎ দৌড় দেয়ার মতো ভঙ্গি করে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। এমন কোনো বৃদ্ধের দেখা পেলে অনেকটা সময় পার করা যায়।

আজ আমার দিন খারাপ। ঠেলাগাড়ি নেই, বৃদ্ধ নেই। আষাঢ় মাসেও দিন ঝকঝক করছে। বৃষ্টির দেখা নেই। আকাশ ঘন নীল। শান্তির নীল রঙ না, উত্তাপের নীল। আষাঢ় মাসে রোদে হাঁটতে ভালো লাগে না। আষাঢ় মাসে মাথার ওপর মেঘ নিয়ে হাঁটতে ভালো লাগে।

রোদ মাথায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম রমজান মিয়ার কাছে। রমজান মিয়া রাস্তার এক কোনায় ছাতা মাথায় বসে আছে। তার ঝুড়িতে আম নেই। সে বসেছে ডালা নিয়ে, ডালা ভর্তি লটকন। ডালার দিকে তাকালে মনে হয় হলুদ ফুল ফুটে আছে।

রমজান মিয়া আমাকে দেখেই আনন্দিত গলায় বলল, আসেন ছাতির নিচে আসেন। আপনের দেখা যে আইজ পামু এইটা জানি।

কীভাবে জানেন ?

মানুষের ভিতর ইশারা চলাচল করে। ইশারায় জানি।

আম পান নাই ?

না। লটকন খান। বাজারের সেরা লটকন। লটকন কেমনে খাইতে হয় জানেন ? রইদে বইসা খাইতে হয়। একেক ফল খাওয়ার একেক নিয়ম। কমলা খাইতে হয় ছেমায় বইসা, তেঁতুল খাইতে হয় গাছের নিচে।

তেঁতুল গাছের নিচে বসে খেতে হয় ?

অবশ্যই। গাছের ছেমায় বইসা তেঁতুল খাওনের মজাই অন্যরকম।

ফল খাওয়ার এইসব নিয়ম আপনি বের করেছেন ?

জি। ফল নিয়া বইসা থাকি। কাজ নাই কর্ম নাই। বইসা বইসা চিন্তার মাধ্যমে নানান জিনিস পাই।

কী পান ?

আল্লাহপাকের কুদরতের দেখা পাই। ভালো কইরা চিন্তা করেন ছোট ভাই, গাছের বিষয়ে চিন্তা করেন। কোনো গাছ দেয় মধুর মতো মিষ্ট ফল, কোনো গাছ দেয় বোম্বাইয়া মরিচের মতো ঝাল মরিচ। কোনো গাছ ফল দেয় মানুষের জন্যে, আবার কোনো গাছ ফল দেয় পাখিদের জন্যে। সেই ফল মানুষ খাইতে পারে না, তার তিতা লাগে। পাখিরা আনন্দ কইরা খায়।

কোন ফল পাখিরা আনন্দ করে খায় ?

মাকাল ফল। বড়ই সৌন্দর্য ফল, কিন্তু মানুষের জন্য বিষ। ছোটভাই, শুকনা আলাপ শুইন্যা লাভ নাই। লটকন খান। আপনার উছিলায় আমিও দুইটা খাব। আমার সাথে লবণ আছে। তিনটা লটকনের দানা মুখে দিবেন আর এক চিমটি লবণ। দেখেন স্বাদ কারে বলে।

আমরা লটকন খাওয়া শুরু করলাম। আমাদের খাওয়া দেখে মুগ্ধ হয়েই হয়তো অতি দ্রুত ডালার সব লটকন বিক্রি হয়ে গেল। রমজান মিয়া ডালা গোছাতে গোছাতে বলল, ছোটভাই, দুপুরে তো আপনে খানা খান নাই। চলেন আমার সাথে, খানা খাব।

আমি বললাম, খানা যে খাই নি বুঝলেন কীভাবে ? ইশারায় ?

জি ইশারায়। ইশারা একটা মারাত্মক জিনিস, বুঝলেন ছোটভাই! ইশারা বুঝতে পারলে কথা বলার প্রয়োজন হয় না। আফসোস, আমরা বেতালা কথাই বলি— ইশারা বুঝি না। বুঝার চেষ্টাও নেই না।

রমজান মিয়া থাকে আগারগাঁওয়ের এক বস্তিতে। এক কামরার টিনের ঘর। বারান্দা আছে। বারান্দায় রান্নার ব্যবস্থা। সেখানে দড়ির একটা চারপাই পাতা আছে। চারপাইয়ের একটা পা সাইকেলের চেইন দিয়ে ঘরের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। চারপাই যাতে চুরি না হয় সেই ব্যবস্থা।

আমি বললাম, আপনি একা থাকেন ?

ঢাকায় একলাই থাকি। পরিবার দেশে থাকে।

রমজান মিয়া অতি দ্রুত রান্না করে ফেলল। ভাত, শুকনামরিচের সঙ্গে রসুন পুড়িয়ে একটা ভর্তা আর ডাল।

আমি আগ্রহ করে খাচ্ছি। রমজান মিয়াও আগ্রহ করে খাচ্ছে।

ছোটভাই, খাইয়া মজা পাইতেছেন ?

হুঁ। অতি সুখাদ্য।

ইশারায় বুঝেছি। আপনে মজা পাইছেন। পেটে ক্ষুধা ছিল এইজন্য মজা পাইতেছেন। পেটের ক্ষুধা আল্লাহপাকের আরেক কুদরত। পেটে ক্ষুধা না থাকলে বেহেশতি খানাতেও কোনো মজা নাই। ছোটভাই, আপনে অনেক লোক দেখবেন— খাবার ঘরে খানাখাদ্য বেশুমার, কিন্তু তারার পেটে ক্ষুধা নাই বইল্যা খাইতে পারে না। আহা কী কষ্ট!

রমজান মিয়া চারপাইয়ে পাটি পেতে দিয়েছে। তার ঘরের সঙ্গে লাগোয়া রেন্টিগাছের ছায়া এসে পড়েছে চারপাইয়ে। আমি মাথার নিচে বালিশ দিয়ে শুয়ে আছি। আমার চোখ ভারী হয়ে আসছে। রমজান মিয়ার মতো আমিও ইশারায় বুঝতে পারছি, আজ আমার ফাটাফাটি ঘুম হবে। ঘুম ভাঙবে যখন গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়বে তখন। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নাই। তারপরেও বৃষ্টির কথাটা কেন মনে হলো কে জানে!

ঘুমের মধ্যে নীলা ফুপুকে স্বপ্নে দেখলাম। ফুপু শুটিং করছেন। মুকুল ভাই ডিরেক্টর। নায়ক ফুপুকে বলবে, আমি এখন আর তোমাকে ভালোবাসি না। তুমি বনের পংখি, তুমি বনে ফিরে যাও। নায়কের কথা শুনেই ফুপু কাঁদতে শুরু করবেন। ফুপু এই অংশটা করতে পারছেন না। নায়কের কথা শেষ হওয়া মাত্র ফুপু হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছেন। তিনবার এরকম হবার পর পরিচালক মুকুল ভাই রাগে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এলেন। ফুপু বললেন, মুকুল ভাই, আমার কোনো দোষ নেই। হিরোর ডায়ালগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পেছন থেকে কাতুকুতু দিচ্ছে, এই জন্যে আমি হেসে ফেলছি। সরি।

মুকুল ভাই বললেন, কোন বদমাশটা তোমাকে কাতুকুতু দিচ্ছে ?

বাবলু কাতুকুতু দিচ্ছে। ওকে কিছু বলবেন না প্লিজ। ও আমার ছোটভাই। বাচ্চা মানুষ। (স্বপ্নে সম্পর্ক খানিক উলটপালট হয়েছে। আমি রমজান মিয়ার ছোটভাই। ফুপুর না।)

মুকুল ভাই বললেন, ঐ ছোকরাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো। টিপে আমি তার রস বের করে দেব।

ফুপু বললেন, ওকে শাস্তি দিলে আমি কিন্তু শট দেব না। আমার এক কথা।

মুকুল ভাই ফুপুর কথা শুনলেন না। তিনি আমার হাত ধরে বললেন, একে তো আমি চিনি। এই বদছেলে আমার কাছ থেকে পাঁচশ' টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তোমরা এই বদটার মাথায় পানি ঢালতে থাক। আমি না বলা পর্যন্ত থামবে না।

কয়েকজন মিলে আমার মাথায় পানি ঢালছে। বরফশীতল পানি। আমি ঠাণ্ডায় কাঁপছি।

এই পর্যায়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখি প্রবল বর্ষণ হচ্ছে। আমার সমস্ত শরীর ভেজা। ঘরের ভেতর থেকে হাসি হাসি মুখে রমজান মিয়া আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে মনে হয় খুব মজা পাচ্ছে।



নীলা ফুপুর চোখ লাল। মুখ ফোলা। তিনি গত দুদিন ধরে ঘরে আছেন। ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। রাতে মনে হয় ঘুমাচ্ছেনও না। কাল রাত তিনটার সময়ও দেখেছি তাঁর ঘরে বাতি জ্বলছে। অসুখ-বিসুখ নিশ্চয়ই না। অসুখ হলে চাদর গায়ে বিছানায় শুয়ে থাকতেন। মাথা টিপে দেবার জন্যে কিংবা মাথায় পানি ঢালার জন্যে আমার ডাক পড়ত। এখনো ডাক পড়ছে না। বড় কোনো ঘটনা হয়তো ঘটেছে। নাটক থেকে বাদ পড়েছেন। কিংবা মুকুল ভাই আরো কোনো কাণ্ড ঘটিয়েছেন। সন্ধ্যাবেলায় আমি তাঁর ঘরে উঁকি দিলাম। তিনি চাদর গায়ে চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন। আমাকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ভাঙা গলায় বললেন, কী চাস ?

আমি বললাম, কিছু চাই না। তোমার গলা ভাঙল কীভাবে ?

ফুপু বললেন, হুট হাট করে ঘরে ঢুকবি না।

চলে যাব ?

চেয়ারে বোস।

আমি চেয়ারে বসলাম। ঘরে বাতি জ্বালানো হয় নি। জানালা বন্ধ। ঘর অন্ধকার। ভ্যাপসা গরমে ফুপু গায়ে চাদর জড়িয়ে রেখেছেন। আমি বললাম, তোমার জ্বর না-কি ?

জানি না। তুই একটা কাজ করে দে, আমাকে ঘুমের ওষুধ কিনে এনে দে। পঞ্চাশটা কিনবি, ইউনিকট্রিন। নাম মনে থাকবে ?

না।

আমি লিখে দিচ্ছি। একটা ফার্মেসি থেকে এতগুলি দিবে না। বিভিন্ন ফার্মেসিতে যাবি, ঘুরে ঘুরে কিনবি। পারবি না ?

পারব।

এতগুলো ঘুমের ওষুধ দিয়ে কী করব জিজ্ঞেস করলি না ?

খাবে। ঘুমের ওষুধ দিয়ে মানুষ আর কী করে ?

এতগুলা ওষুধ একসঙ্গে খেলে আমার অবস্থা কী হবে বুঝতে পারছিস ?

একসঙ্গে খাবে ?

অবশ্যই একসঙ্গে খাব। এ ছাড়া আমার কোনো গতি নেই।

ফুপু, বাতি জ্বালাব ?

না।

মুখ দেখতে পাচ্ছি না তো! এইজন্যে কথা বলে আরাম পাচ্ছি না।

গাধার মতো কথা বলিস না। আর পা দোলাচ্ছিস কেন ? পা দোলাবি না। গাধা!

আমি পা দোলানো বন্ধ করলাম। অন্ধকার চোখে সয়ে গেছে। ফুপুর চেহারা দেখা যাচ্ছে। তাঁকে খুবই সুন্দর লাগছে। মানুষের চেহারার এই এক অদ্ভুত ব্যাপার। সব আলোয় সব মানুষকে একরকম দেখা যায় না। কাউকে দুপুরের খটখটা আলোয় ভালো লাগে। কাউকে ভালো লাগে সকালে, আবার কাউকে আধো আলো আধো অন্ধকারে।

বাবলু!

বল শুনছি।

তোকে পা দোলাতে নিষেধ করেছি, তুই তো দুলিয়েই যাচ্ছিস।

ফুপু আমি পা দোলাচ্ছি না।

ড্রয়ার খুলে দেখ টাকা আছে, একশ' টাকার একটা নোট নিয়ে যা। আমার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট আনবি।

তুমি সিগারেট খাও ?

হঠাৎ হঠাৎ খাই। আমাদের অভিনয়ের লাইনে অনেকেই খায়। চন্দনা বলে যে মেয়েটা আছে, মডেলিং করে, সে তো চেইন স্মোকার। চন্দনাকে চিনেছিস ?

না।

চকলেটের অ্যাড করেছে। সুন্দর অ্যাড। বয়স কত শুনলে চমকে উঠবি— ত্রিশ। সে অবশ্যি মুখে বলে আঠারো। মেকাপ ছাড়া চন্দনাকে দেখলে তোর ইচ্ছা করবে গালে থাপ্পড় মারতে। গিরগিটির শরীরের মতো উঁচা-নিচা চামড়া। বিরাট বিরাট গর্ত। পেনকেক দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হয়।

পেনকেকটা কী ?

পেনকেক কী তোকে বলতে পারব না। সিগারেট আনতে বলছি আন। মালবরো লাইট আনবি।

এইটা কি তোমার ব্র্যান্ড ?

আমার কোনো ব্র্যান্ড-ফ্রেন্ড নেই। আমি তো চন্দনার মতো চেইন স্মোকার না যে আমার ব্র্যান্ড লাগবে। যখন যেটা পাই খাই। মালবরোটা ভালো। আমেরিকান সিগারেট। রোস্টেড টোবাকো।

রোস্টেড টোবাকো কী জিনিস ?

এতকিছু তোকে বলতে পারব না।

আমি সিগারেট কিনে এনে দেখি ঘরে বাতি জ্বলছে। ফুপুর গায়ে চাদর নেই। তিনি হাত-মুখ ধুয়েছেন। মনে হয় কাপড়ও বদলেছেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি বাইরে যাবার জন্যে তৈরি। তাঁর ভাঙা গলাও ঠিক হয়ে গেছে। তিনি সিগারেটের প্যাকটটা হাতে নিতে নিতে বললেন, আমার জন্যে কড়া করে এক কাপ চা নিয়ে আয়। সিগারেট শুধু শুধু খেয়ে আরাম পাওয়া যায় না। চায়ের সঙ্গে খেতে হয় কিংবা ড্রিংকসের সঙ্গে।

তুমি ড্রিংকসের সঙ্গে কখনো খেয়েছ ?

দু'একবার পাল্লায় পড়ে খেয়েছি। জিন এন্ড লাইম। এক ধরনের ককটেল। জিন সামান্যই থাকে।

খেতে কেমন ?

শরবতের মতো একটু তিতা ভাব আছে। তোর কি খেতে ইচ্ছা করছে না-কি ?

হুঁ।

খবরদার! এইসব জিনিসের ধারে কাছে যাবি না। তুই গাধা আছিস গাধাই থাকবি। ঘোড়া হতে যাবি না।

ফুপু, গাধা নিয়ে একটা জোক আছে। তোমাকে বলি ? খুবই মজার।

ফুপু চোখ সরু করে তাকিয়ে আছেন। জোক শোনার ব্যাপারে তাঁর ভালোই আগ্রহ আছে। তবে বেশিরভাগ জোকই তিনি ধরতে পারেন না। সবাই যখন হাসে তখন তিনি করুণ মুখ করে সবার দিকে তাকান। মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে হাসেন। হাসার পর তার মুখ আরো করুণ হয়ে যায়।

আমি জোক শুরু করলাম— ফুপু শোন। একবার এক ছেলে স্কুল থেকে বাসায় ফিরে মা'কে বলছে, মা, আজ আমাদের স্কুল টিচার আমার খুব প্রশংসা করেছেন। ছেলের মা বললেন, উনি কী বলেছেন ? ছেলে বলল, স্যার আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা সবাই গাধা। তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আর এই রঞ্জুটা সবচে' বড় গাধা!

ফুপু হাসতে শুরু করেছেন। তার হাসি বিখ্যাত। বেশিরভাগ সময়ই হাসতে হাসতে তাঁর হেঁচকি উঠে যায়। তিনি বিষম খান। একবার তো খাট থেকে মাটিতে পড়ে ভালো ব্যথাও পেয়েছিলেন।

ফুপু হাসছেন। তাঁর হাসির মিটারের কাঁটা লাফিয়ে লাফিয়ে উপরের দিকে উঠছে। আমি তাঁকে হাসন্ত অবস্থায় রেখে তাঁর জন্যে চা আনতে গেলাম। আমি নিশ্চিত ফিরে এসে দেখব তাঁর হাসি তখনো বন্ধ হয় নি। হাসির সঙ্গে হেঁচকি যুক্ত হয়েছে।

সে রকম দেখা গেল না। ফুপু আগের অবস্থায় ফিরে গেছেন। বসে আছেন খাটে। গায়ে চাদর। ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়েছেন। তবে বাথরুমের বাতি জ্বলছে। বাথরুমের দরজা সামান্য খোলা বলে বাথরুমের আলো এসেছে। ঘর সিগারেটের ধোঁয়ায় ভর্তি। চা বানিয়ে আনার অতি অল্প সময়ে তিনি কয়েকটা সিগারেট খেয়ে ফেলেছেন বলে আমার ধারণা। ফুপু চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বললেন, চন্দনা মেয়েটা কী যে বিপদে পড়েছে! মেয়েটার ভালো বিয়ে ঠিক হয়েছিল। ছেলে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। ইউরোপিয়ানদের মতো চেহারা। লম্বা, ফর্সা, খাড়া নাক। একদিন চন্দনার সঙ্গে শুটিং-এ এসেছিল দেখেছি। সেই বিয়ে বাতিল।

কেন ?

চন্দনার একটা বাজে ভিডিও বাজারে রিলিজ হয়েছে।

তার মানে কী ?

ফুপু হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে নতুন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, চন্দনা একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করেছিল— সেই ভিডিও গোপনে করা হয়েছে। তারপর ছেড়ে দিয়েছে ইন্টারনেটে। সেখান থেকে নিয়ে ভিডিও কোম্পানি সিডি বের করে বাজারে ছেড়ে দিয়েছে। সিডির নাম— নাইট কুইন চন্দনা। তবে কভারে তারা চন্দনার একটা নরম্যাল ছবি দিয়েছে। শাড়ি পরা ছবি। এই ছবি দেখলে বোঝাই যাবে না ভেতরে কী আছে।

আমার ক্ষীণ সন্দেহ হলো এরকম একটা সিডি ফুপুকে নিয়েও বের হয়েছে। তাঁর নির্ঘুম রাত কাটানো, ঘুমের ওষুধ কিনতে চাওয়ার পেছনে আর কোনো কারণ থাকার কথা না। আমি সাহস করে বলে ফেললাম, ফুপু, তোমারও কি সিডি বের হয়েছে ?

ফুপু কঠিন চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভাঙা গলায় বললেন, তোকে কে বলেছে ? জহির ?

আমি বললাম, আমাকে কেউ বলে নি। আমি অনুমান করেছি।

থাপ্পড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব, আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা ? অবশ্যই তোকে জহির বলেছে। সে না বললে তুই জানবি কীভাবে ? জহির ভিডিওর দোকানের মালিক হয়ে বসেছে। আজেবাজে ভিডিও বিক্রি করে পয়সা কামাচ্ছে। ছোটলোক কোথাকার!

ফুপু হাউমাউ কান্না শুরু করলেন। তাঁর কান্নাও হাসির মতো বিখ্যাত। একবার শুরু হলে থামে না। চলতেই থাকে। তাঁকে এই অবস্থায় রেখে ঘর থেকে বের হলাম। কিছুক্ষণ ছাদে হাঁটলাম। এই বাড়ির ছাদ বিপজ্জনক ছাদ। রেলিং দেয়া হয় নি। বর্ষায় শ্যাওলা পড়ে ছাদ পিচ্ছিল হয়ে থাকে। এমন একটা পিচ্ছিল ছাদের ধার ঘেঁসে একজনই হাঁটতে পারে, তাঁর নাম জহির। জহির ভাই প্রতি বর্ষায় দু'তিনবার এই কাজটা করেন। তাঁর নাকি মজা লাগে।

ছাদের ঠিক মাঝখানে এগারোটা ফুলের টব আছে। টবগুলির মালিক ফুপু। তাঁর জন্ম এগারো অক্টোবর বলে এগারো তাঁর লাকি সংখ্যা। এইজন্যে ফুলের টবের সংখ্যা এগারো। ফুপু তাঁর টবগুলির কোনো যত্ন নেন না। সব গাছই কিছুদিনের মধ্যে মরে যায়। তখন আবার কেনা হয়। ফুপু ঠিক করে রেখেছেন তাঁর গায়েহলুদ হবে ছাদে। তাঁর চারদিকে তখন থাকবে এগারোটা ফুলের টব। এগারো সংখ্যাও নাকি অতি রহস্যময়। নিউমারোলজি মতে এগারো হচ্ছে দুই। এক এবং এক যোগ করে দুই। নিউমারোলজি মতে ফুপুর জুডায়িক সাইন লিব্রা। এদিকে জন্মতারিখ হিসেবেও তাঁর জুডায়িক সাইন লিব্রা। এটাও নাকি বিরাট ব্যাপার। লিব্রার পাওয়ার বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেল। এইসব হিসাব নিকাশ মুকুল ভাই করে দিয়েছেন। তিনি শুধু যে বিখ্যাত পরিচালক তা-না, তিনি আবার পামিস্ট্রি নিউমারোজি, এস্ট্রলজি এইসবও জানেন।

ফুপু মুকুল ভাইয়ের আদিভৌতিক ক্ষমতায়ও মুগ্ধ। তাঁর প্রসঙ্গ উঠলে ফুপু চোখ বড় বড় করে বলেন— টেলেন্টেড লোক, বুঝলি! হাত দেখে এমন হড়হড় করে তোর অতীত বলবে যে তুই টাসকি খেয়ে যাবি। হিপনোসিসও উনি জানেন। তবে করতে চান না। ব্রেইনে চাপ পড়ে তো এইজন্যে। হিপনোসিস করে উনি যে-কোনো মানুষকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দেবেন। অভিনেতা মাহফুজ ভাই অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন, মুকুল ভাই একদিন তার সামনে বসিয়ে কয়েকটা পাস দিলেন। মাহফুজ ভাই মুখ হা করে ঘুমাতে লাগল। অন রেকর্ড আছে। স্টিল ফটোগ্রাফারকে দিয়ে ছবি তোলানো হয়েছে। যাতে মাহফুজ ভাই পরে অস্বীকার করতে না পারেন। অবশ্যি মাহফুজ ভাই ঠিকই অস্বীকার করেছেন। তিনি সবাইকে বলেছেন, আমি আসলে ঘুমাই নি, ঘুমের ভাণ করেছি।

আমি ছাদ থেকে নামলাম বৃষ্টি শুরু হবার চার-পাঁচ মিনিট পর। এই চার-পাঁচ মিনিট আমি ফুপুর সাজানো এগারোটা টবের মাঝখানে বসে রইলাম। মাঝখানটা ফুপু সাদা রঙ দিয়ে বৃত্ত দিয়ে রেখেছেন। তিনি যখন এখানে বসেন তখন না-কি গাছগুলি থেকে একধরনের এনার্জি পান। আমি কোনো এনার্জি পাই নি। এগারো সংখ্যা আমার জন্যে না, হয়তো এ কারণেই। তাছাড়া এগারোটি টবের মধ্যে মাত্র চারটাতে গাছ আছে। বাকিগুলির গাছ মরে গেছে। এটাও একটা কারণ হতে পারে।

ফুপুর ঘরে আরেক দফা উঁকি দিলাম। আমার প্রধান উদ্দেশ্য ফুপুর কান্না থেমেছে কি-না দেখা, অপ্রধান উদ্দেশ্য টবের গাছগুলি মরে গেছে এই খবর জানানো। চারা কিনতে হলে এখনি কিনতে হবে। বৃক্ষমেলা চলছে। এবারের বৃক্ষমেলার স্লোগান— 'গাছ জীবনের জন্যে'।

বাবলু, দরজা ফাঁক করে উঁকি দিবি না। এইসব আমার পছন্দ না। ঘরে ঢোক।

আমি ঘরে ঢুকলাম।

তুই একজনকে একটা চিঠি দিয়ে আসতে পারবি ?

মুকুল ভাইকে ?

কাকে দেব সেটা পরে বলব। তুই পারবি কি-না সেটা বল। যাওয়া আসার রিকশাভাড়া ছাড়াও আলাদা দু'শ টাকা পাবি।

এখন দিতে হবে ?

হ্যাঁ, এখনই দিতে হবে। তুই চিঠি নিয়ে যাবি, যদি দেখিস উনি বাসায় নেই, তাহলে রাস্তায় অপেক্ষা করবি। যত রাতই হোক অপেক্ষা করবি। চিঠি উনার হাতে দিতে হবে। অন্যের হাতে দেয়া যাবে না।

চিঠি লিখে রেখেছ ?

হ্যাঁ। তোর অন্যের চিঠি খুলে পড়ার অভ্যাস নেই তো ?

না।

আমি জানি নেই। তারপরেও জিজ্ঞেস করলাম। এই চিঠি তুই যদি পড়িস তাহলে রোজ হাশরের দিনে দায়ী থাকবি।

ফুপু আমার হাতে চিঠি দিলেন। খামের ওপর লেখা— পরম শ্রদ্ধাভাজন মুকুল ভাই।

দু'শ টাকা দেয়ার কথা ছিল, আরো একশ' দিলাম। ঠিক আছে ?

ঠিক আছে।

রোজ হাশরে দায়ী থাকার বিষয়টা আমার তেমন ভয়াবহ মনে হলো না। ফুপুর ঘর থেকে বের হয়েই চিঠি খুলে পড়লাম—

মুকুল ভাই,

আপনি আমার কাছে দেবতা। না না, ভুল বললাম, দেবতার চেয়েও বড়। আপনি আমার সব। আপনি যা বলেছেন আমি তাই করেছি। ভবিষ্যতেও করব। যতদিন বাঁচব ততদিন করব। এখন আমার মহাবিপদ। এখন আপনি বলে দিন, আমি কী করব ? আমি কি ঘুমের ওষুধ খাব ? না-কি সিলিং ফ্যানে ফাঁস নিব ? আপনি যা বলবেন তাই হবে।

আমার ওপর তুফান বয়ে যাচ্ছে, আর আপনি শুনলাম হোতাপাড়ায় 'প্রজাপতির মন' নাটকের শুটিং শুরু করেছেন। খবরটা প্রথম বিশ্বাস করি নি। ইতি আপার কাছে টেলিফোন করে নিশ্চিত হয়েছি।

মুকুল ভাই, আপনার-আমার এই ভিডিওটা কে তুলেছে ? আপনি কি বের করতে পেরেছেন ? মনে হয় না আপনার সেই চেষ্টা আছে। কারণ ভিডিওতে আপনাকে চেনা যায় না। আপনি বেশির ভাগ সময় আড়ালে ছিলেন, যে কয়বার ক্যামেরার সামনে এসেছেন আপনার মুখ দেখা যায় নি। আর আমি ছিলাম পুরোপুরি ক্যামেরার সামনে। আমাকে সবাই চিনবে। আমার সঙ্গের পুরুষ মানুষটাকে কেউ চিনবে না।

মুকুল ভাই, আমি কী করব আপনি বলে দিন। প্লিজ প্লিজ প্লিজ! আরেকটা কথা, 'প্রজাপতির মন' নাটকে আপনি আমাকে একটা রোল দিবেন বলেছিলেন। নায়িকার সৎবোন আমার করার কথা ছিল। অথচ সেই রোল এখন ইতি করছে। আমার কপাল এত খারাপ কেন মুকুল ভাই ? আমার আরো অনেক আগেই মরে যাওয়া উচিত ছিল। কেন এখনো বেঁচে আছি ? হে দয়াময়, তুমি আমার মৃত্যু দাও। মৃত্যু দাও। মৃত্যু দাও।

ইতি—
আপনার কাছের এক অভিমানী
নীলা

চিঠির শেষে অনেকগুলি ক্রস চিহ্ন। সাংকেতিক কোনো ভাষা। কয়েকটা ক্রস আবার বৃত্ত দিয়ে ঢাকা।

সময় কাটানোর জন্যে আমি চলে গেলাম 'দি ইমেজ'-এ। রাত করে বাসায় ফিরতে হবে। ফুপুর কাছে প্রমাণ করতে হবে আমি অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে মুকুল ভাইয়ের হাতে চিঠি দিয়েছি। লুকিয়ে থাকার জন্যে দি ইমেজ ভালো জায়গা। জহির ভাই জাহাজ ভাঙা ফার্নিচারের দোকান থেকে লোহার একটা বাথটাব কিনেছেন। সেটা এখনো দেখা হয় নি। নিশ্চয়ই ভালো কিছু হবে। জহির ভাই জঞ্জাল কিনে বাড়ি ভর্তি করার মানুষ না।

জহির ভাই বাথটাবেই ছিলেন। আধশোয়া হয়ে বই পড়ছেন। বইটার নাম— The Spiral Staircase। কভারে একটা মেয়ের ছবি। মেয়েটা পার্কের বেঞ্চে বসে বই পড়ছে। ইদানীং জহির ভাইয়ের বই পড়া রোগ হয়েছে। যখনই তার ঘরে যাই দেখি তিনি বই পড়ছেন। তাঁর শোবার ঘর ভর্তি করে ফেলেছেন বই দিয়ে।

বাথটাবটা দেখে তেমন ভালো কিছু মনে হলো না। বাথটাব হয় লম্বা, এটা গোল ধরনের। নিচে চাকা আছে। তিনটা চাকা। চাকার কারণে এটাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঠেলে নেয়া যায়। এখন বাথটাবটা জহির ভাইয়ের শোবার ঘরে। বিছানার সঙ্গে লাগানো।

জহির ভাই আমাকে দেখে বললেন, খবর কী রে ?

আমি বললাম, খবর নেই।

আজ দুপুর থেকে বাথটাবে বসা। মাঝখানে দু'বার উঠে শুধু বাথরুমে গিয়েছি।

বাথটাবে কতক্ষণ থাকবে ?

বুঝতে পারছি না। সারারাত থাকতে পারি, আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে উঠে যেতে পারি।

জহির ভাই হাতের বই বিছানায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ গম্ভীর গলায় বললেন, তোর ফুপুর খবর কী বল তো ? সে কি স্বাভাবিক আছে ? নাটক করে বেড়াচ্ছে ?

মোটামুটি স্বাভাবিক।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার হাতে দে। বাথটাবে শুয়ে থাকলে একটাই সমস্যা, ভেজা হাতে সিগারেট ধরানো যায় না।

আমি সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। জহির ভাই সিগারেট টানতে টানতে বললেন, তোর ফুপু বাংলাদেশের সবচে' বোকা মহিলা। ঠিক বলেছি কি-না বল!

ঠিক বলেছ।

তাকে তুই একটা কথা বলতে পারবি ?

পারব।

তাকে বলবি যে, তার ব্যাপারটা আমি দেখছি। এর বেশি কিছু বলতে হবে না। এইটুকু বললেই বুঝবে।

আচ্ছা বলব। আজই বলব।

তোর বাবার খবর কী ?

জানি না। অনেক দিন দেখা হয় না।

উনার মামলা কোর্টে কবে উঠবে ?

জানি না।

খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাবি। ঐদিন কোর্টে থাকব।

আচ্ছা।

আর আমার মা'র খবর কী ?

ভালোই আছে।

ভূত-প্রেত এখনো দেখছেন ?

হুঁ। একটা ভূত না-কি তাঁর বুড়া আঙুলে কামড় দিয়ে রক্ত বের করে দিয়েছে!

জহির ভাই হাসতে শুরু করেছেন। নীলা ফুপুটাইপ হাসা। হেসেই যাচ্ছেন। হাসি থামছে না।

হাসির শব্দে আকৃষ্ট হয়েই বোধহয় শিয়ালমুত্রা চলে এলেন (তিনি এখন দি ইমেজেই থাকেন)। শিয়ালমুত্রার গায়ে ঘাগরা জাতীয় একটা ঝলমলে পোশাক। তাঁর চেহারায় কিছু পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তনের কারণ মাথার চুল। চুল রঙ করিয়ে সোনালি করা হয়েছে। চোখের পাতাতেও সোনালি রঙ দিয়েছেন। তিনি মুখে যে রঙ-চঙ মেখেছেন তাতে বোধহয় কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। মুখের দাঁত আরো ভেসে উঠেছে। এমন চেহারা মুকুল ভাইয়ের চোখে পড়লে কাজ হতো। মুকুল ভাই তাঁকে অবশ্যই রোল দিতেন— নায়িকার ভ্যাম্প মা টাইপ রোল। ভূতের নাটক হলে পেত্নীর রোল।

শিয়ালমুত্রা জহির ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে খুকিদের মতো গলায় বললেন, তুমি এখনো পানিতে ? জ্বর বাধাবে তো। তুমি যদি দশ মিনিটের মধ্যে না ওঠো তাহলে কিন্তু আমি একটা কাণ্ড ঘটাব। ঘড়ি ধরে দশ মিনিট। এই এখন থেকে শুরু হলো। আমি ঠিক দশ মিনিট পরে টাওয়েল-হাতে আসব।

জহির ভাই বিছানায় রাখা বই আবার টেনে নিলেন। তিনি দশ মিনিটের মধ্যে উঠবেন কি উঠবেন না এটা বোঝা যাচ্ছে না।

শিয়ালমুত্রা এবার আমার দিকে তাকিয়ে মধুর গলায় বললেন, খোকা, তুমি একটু আমার সঙ্গে এসো তো! তোমার সঙ্গে কথা আছে। তোমার নাম যেন কী ?

বাবলু।

বাবলু এসো।

আমি বাধ্য ছেলের মতো তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন ভিডিও কাউন্টারে। ভিডিও কাউন্টারে লোকজন নেই। টিভিতে কী একটা হিন্দি ছবি চলছে। শিয়ালমুত্রা রিমোট কন্ট্রোলে ছবি বন্ধ করলেন। তাঁর গলার স্বর থেকে কোমল ভাব দূর হয়ে গেল। তিনি খসখসে গলায় বললেন, তোমার ফুপু যে একজনের সঙ্গে 'সেক্স' করেছে আর সেই ছবি সিডিতে এসেছে, এইটা জানো ?

আমি বললাম, জানি।

বাহ্বা। বিরাট লায়েক ছেলে তুমি। দেখেছ সেই ছবি ?

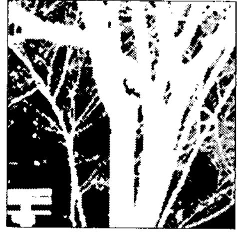
না।

দেখ নাই কেন ? আত্মীয়স্বজনের সেক্স দেখতে ভালো লাগে না ? অন্যেরটা দেখতে ভালো লাগে ? সবসময় এইখানে ঘোরাঘুরি করো কেন ? যাও, বাড়িতে যাও। আর যদি কখনো এখানে তোমাকে দেখি থাপ্পড় দিয়ে দাঁত ফেলে দিব। যাচ্ছ না যে, ব্যাপার কী ?

এখন যেতে পারব না। রাত এগারোটার দিকে যাব।

তোমার সাহস তো কম না! তুমি এক্ষণ যাবে। এক্ষণ। আমি বললাম এক্ষণ, এক্ষণ।

শিয়ালমুত্রার হিস্টিরিয়ার মতো হয়ে গেল। শরীর কাঁপাতে কাঁপাতে তিনি বলেই যাচ্ছেন— এক্ষণ, এক্ষণ, এক্ষণ। তাঁর বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ছে। চোখ লাল। আমি ঘর থেকে বের না হলে এই মহিলা অবশ্যই মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। আমি বের হয়ে গেলাম।



আষাঢ় মাসের উনিশ তারিখ ফুপু ঘুমের ওষুধ খেলেন। ঘটনাটা বাংলা মাসের হিসাবে লিখলাম। কারণ উনিশ তারিখ ছিল আষাঢ়ি পূর্ণিমা। আকাশ ছিল পরিষ্কার। আগের দিন ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় মেইন গ্রিড ফেইল করেছিল। অন্ধকার শহর জোছনায় ডুবে গিয়েছিল।

ফুপু ঘুমের ওষুধ খাবার জন্যে বেছে বেছে এই দিনটা বের করলেন। কারণ তিনি একবার একটা নাটক করেছিলেন যেখানে নায়িকা আষাঢ়ি পূর্ণিমাতে বিষ খায়। নায়িকার ডেডবডিতে জোছনার আলো পড়ে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে গান হয়—

জোছনা আমার ভালো লাগে গো সখী
জোছনা আমার ভালো লাগে।

ফুপু তাঁর জীবনের বেশির ভাগ কাজই ঠিকমতো করতে পারেন নি। ঘুমের ওষুধ খাবার কাজটাও ঠিকমতো পারলেন না। একটা কাগজে লিখলেন—'আমার মৃত্যুর জন্যে কেহ দায়ী নয়'। নিচে নাম সই করতে ভুলে গেলেন। একগাদা ঘুমের ওষুধ একসঙ্গে গিলতে গিয়ে বমি করে বেশির ভাগই ফেলে দিলেন। কাজের মেয়ে কী কারণে যেন তখন তাঁর ঘরে গেল। তিনি কাজের মেয়েকে বললেন, আমি ঘুমের ওষুধ খাচ্ছি। খবরদার, কেউ যেন এটা না জানে। কেউ জানলে আমি তোকে খুন করে ফেলব।

কাজের মেয়ে সবাইকে বলল। অ্যাম্বুলেন্স এলো, ফুপুকে মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হলো। স্টমাক ওয়াশ, ইনজেকশান, হাসপাতাল হয়ে নানান যন্ত্রণার শেষে ফুপু আধমরা হয়ে বাসায় ফিরলেন পাঁচদিন পরে। আমার সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, তেঁতুলের আচার খাওয়াতে পারবি ? তেঁতুলের আচার খেতে ইচ্ছা করছে। খাওয়াতে পারবি ?

ফুপু যেদিন বাসায় ফিরলেন তার তিনদিনের মাথায় ভরদুপুরে জহির ভাই খবর পাঠালেন, আমি যেন ফুপুকে নিয়ে দি ইমেজ-এ যাই। জরুরি প্রয়োজন। ফুপু কিছুতেই যাবেন না। আমিই ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাঁকে রাজি করালাম।

সোমবার দি ইমেজ-এ সাপ্তাহিক ছুটি। আজ সোমবার। দি ইমেজ-এর সদর দরজার কলাপসেবল গেট তালাবন্ধ। ফুপুকে নিয়ে গেটের সামনে দাঁড়াতেই কলাপসেবল গেটের দরজা খুলে গেল। দরজা খুললেন ম্যানেজার। তাঁর মুখ অন্যদিনের চেয়েও গম্ভীর। আমরা ঢুকতেই তিনি আবার গেটে তালা লাগিয়ে দিলেন।

দি ইমেজ-এর শো-রুম খালি, শুধু শিয়ালমুত্রা বসে টিভিতে হিন্দি ছবি দেখছেন। সাউন্ড ছাড়া ছবি। ছবিতে গানের দৃশ্যে নাচানাচি হচ্ছে। নিঃশব্দ নাচানাচি। আমাদের দেখে শিয়ালমুত্রা আগ্রহের সঙ্গে তাকালেন। ফুপুকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। শুধু তাই না, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ভালো আছেন ? ফুপু জবাব দিলেন না।

আমরা ঢুকলাম জহির ভাইয়ের বসার ঘরে। খাটে পা ঝুলিয়ে মুকুল ভাই বসে আছেন। তাঁর গায়ে গোলাপি রঙের হাওয়াই শার্ট। তিনি সিগারেট টানছেন, তাঁকে তেমন চিন্তিত মনে হচ্ছে না। তাঁর পাশেই প্রায় গা ঘেঁসে আরেকজন বসে আছেন। তাঁর পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি। তাঁকে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকের মনে হয় হাঁপানি আছে। একটু পরপর বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। ইনার বয়স কম। অবশ্যই ত্রিশের নিচে। তবে মাথার চুল পড়ে গেছে। দরজার পাশে চেয়ারে বলশালী এক লোক বসে আছে। তার গায়ে সবুজ স্ট্রাইপের ফুল শার্ট। এই লোক কারো দিকেই তাকাচ্ছে না। সে দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে এক মনে দাঁত খোঁচাচ্ছে। খোলা দরজার বাইরে কে যেন হাঁটাহাঁটি করছে। সে মাঝে মাঝে দরজার সামনে থমকে দাঁড়াচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে।

ফুপু মুকুল ভাইকে দেখে হা হয়ে গেছেন। তবে মুকুল ভাই ফুপুকে দেখে কোনো রি-অ্যাকশান দেখান নি। বরং মনে হবে তিনি ফুপুকে চেনেন না।

জহির ভাই বললেন, মুকুল সাহেব, কফি খাবেন ?

মুকুল ভাই বললেন, খেতে পারি।

দরজার বাইরে যে লোক হাঁটাহাঁটি করছিল সে সঙ্গে সঙ্গেই কফি নিয়ে ঢুকল। কফি নিশ্চয়ই আগেই তৈরি ছিল। জহির ভাই বললেন, মুকুল সাহেব, আপনার নাটকে আমাকে নেয়া যাবে ? আমার চেহারা ঠিক আছে না ?

মুকুল ভাই কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, শুধু চেহারায় নাটক হয় না। অভিনয় জানেন ?

জহির ভাই বললেন, জানি না। আপনি শিখিয়ে নেবেন।

আমার প্রতিষ্ঠান অভিনয় শেখানোর স্কুল না। আমি কাজ করি ফিনিসড প্রোডাক্ট নিয়ে।

অভিনয়ের শখ ছিল।

জেনুইন শখ থাকলে আমার অফিসে একদিন আসুন— অডিশন নিয়ে দেখি।

কবে আসব ?

খোঁজখবর নিয়ে যেদিন অফিসে থাকি সেদিন আসবেন। আমি সবদিন অফিসে যাই না।

জহির ভাই বললেন, একদিন চলে যাব। এখন কাজের কথায় আসি। আপনি কি কখনো পাঁঠাকে খাসি করানোর প্রক্রিয়া দেখেছেন ?

মুকুল ভাই তাকিয়ে রইলেন, কিছু বললেন না। তাঁর চোখে বিস্ময়।

জহির ভাই বললেন, প্রক্রিয়াটা সহজ। পাঁঠার বিচি ফেলে দিয়ে রসুনের কোয়া ভরে সেলাই করে দেয়া হয়। পাঁঠা দু'একটা চিৎকার শুধু দেয়। অপারেশনের পর পরই ঘাস খেতে শুরু করে। যেন কিছুই হয় নি।

মুকুল ভাই বললেন, আমাকে এসব বলার মানে কী ?

জহির ভাই বললেন, আপনাকে বলার কারণ হচ্ছে এই প্রক্রিয়ায় আপনাকে খাসি করা হবে। সমাজের স্বার্থে এটা করা হচ্ছে। আপনার পাশে যিনি বসে আছেন তিনি একজন পাস করা ডাক্তার। অপারেশন তিনিই করবেন। লোকাল অ্যানেসথেসিয়া দেয়া হবে, ব্যথা পাবেন না। আমার তো ধারণা, অপারেশনের পর ঘণ্টাখানিক বিশ্রাম নিয়ে আপনি বাড়ি চলে যেতে পারবেন। হালকা খাওয়া-দাওয়া করতে পারবেন। পাঁঠা পারলে আপনি পারবেন না কেন ?

রসিকতা করছেন ?

নারে ভাই! আমি রসিক লোক না। রসিকতা করতে পারি না। এই, তোমরা এর কাপড় খুলে ফেল। ভালো করে খাটের সঙ্গে বাঁধ। আপনার কফি খাওয়া শেষ হয়েছে তো! না-কি আরেক কাপ খাবেন ?

মুকুল ভাইয়ের চোখে-মুখে এই প্রথম ভয়ের ছায়া দেখা গেল। তবে তিনি এখনো বিশ্বাস করছেন না যে, এরকম কিছু করা হবে। তিনি কফির কাপে আরেকবার চুমুক দিলেন। জহির ভাই বললেন, আমার তেমন তাড়া নেই। আপনি আরাম করে কফি খান। আপনি যখন ইয়েস বলবেন তখনি ডাক্তার সাহেব কাজ শুরু করবেন, তার আগে না।

মুকুল ভাই চাপা গলায় বললেন, জহির না আপনার নাম ?

জি।

আপনার সঙ্গে আড়ালে দুটা কথা বলতে পারি ?

জি-না। আমি আড়াল-কথা শোনার লোক না।

জহির ভাই দরজার পাশে বসা লোকটির দিকে তাকালেন। তার পরপরই অতি দ্রুত কিছু ঘটনা ঘটল। আমি দেখলাম মুকুল ভাই খাটের সঙ্গে বাঁধা। তাঁর প্যান্ট এবং আন্ডারওয়্যার টেনে নামিয়ে ফেলা হয়েছে। ডাক্তার সাহেব ছোট একটা কালো বক্স খুলে সিরিঞ্জ বের করছেন। মনে হয় এই সিরিঞ্জ দিয়েই লোকাল অ্যানেসথেসিয়া দেয়া হবে।

জহির ভাই বললেন, মুকুল সাহেব, যে ক্যামেরাম্যান আপনার হয়ে ভিডিও ছবিগুলি নানান সময়ে তুলেছে, তার নাম লিয়াকত না ?

মুকুল ভাই বললেন, আমি জানি না।

জহির ভাই বললেন, আমাদের হাতে সময় কম, উল্টা-পাল্টা জবাব না দিলে ভালো হয়। শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি, তার নাম লিয়াকত না ?

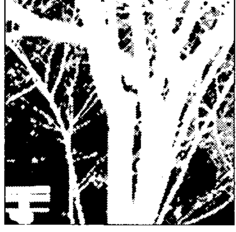
জি লিয়াকত। ভাই সাহেব, আমার একটা কথা শুনুন। প্লিজ! দুটা মিনিট শুধু আপনি আর আমি...

জহির ভাই বললেন, এই বদটার মুখে একটা স্পঞ্জের স্যান্ডেল দিয়ে দাও। তাহলে চিৎকার করতে পারবে না। দাঁতে দাঁত কামড়ে ধরার সময় জিহ্বারও ক্ষতি হবে না।

মুহূর্তের মধ্যে স্পঞ্জের স্যান্ডেলের গোঁড়ালির অংশ মুকুল ভাইয়ের মুখে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। জহির ভাইয়ের ইশারায় আমি ফুপুকে নিয়ে বাইরে চলে এলাম। ফুপু জম্বির মতো হয়ে গেছেন। হাঁটতে পারছেন না, কথা বলতে পারছেন না। তাঁর শরীর কাঁপছে, মুখ দিয়ে লালা পড়ছে।

ফুপুকে দি ইমেজ-এর শো-রুমে এনে ফ্যানের নিচে বসিয়ে দিলাম। তাঁর ভাবভঙ্গি ভালো না। তিনি যে-কোনো মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে যাবেন— এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, বাসায় যাব। বাসায় যাব। ও বাবলু, বাসায় যাব। শিয়ালমুত্রা ফুপুর অবস্থা দেখে মজা পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। তিনি ফুপুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, ঠাণ্ডা কিছু খাবেন ?

আমাদের বেশিক্ষণ বসতে হলো না। ডাক্তার সাহেব এসে জানালেন— অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে। রোগী ভালো আছে।



আওয়ামী লীগ হরতাল ডেকেছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা। তবে রিকশা চলছে, কিছু প্রাইভেট কার চলছে। এখনকার হরতাল আগের মতো কঠিন হচ্ছে না। কেমন ঢিলেঢালা ভাব। রাস্তায় পুলিশও কম।

আমি বাবার সঙ্গে হাঁটছি। ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছি। হরতালের দিনগুলিতেই মূল রাস্তায় হাঁটা যায়। নির্বিঘ্নে যে হাঁটা যায় তা-না। রাস্তায় ক্রিকেট খেলা হয়। যে-কোনো সময় বল এসে গায়ে লাগতে পারে। কিছু ক্রিকেট খেলা ভালো জমে যায়। চারপাশে উৎসাহী দর্শক জুটে যায়। আমরা এরকম একটা জম্পেশ ক্রিকেট খেলা পার হলাম। বাবা বললেন, বাবলু, তুই ক্রিকেট খেলিস ?

আমি বললাম, না।

কোনো খেলাধুলাই করিস না ?

না।

এটা ঠিক না। খেলাধুলা করতে হবে। খেলাধুলার অনেক উপকারিতা আছে।

বাবাকে বিপর্যস্ত লাগছে। তিনি কুঁজো হয়ে হাঁটছেন। মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ। মাথার চুল আউলা-ঝাউলা। কিছুদিন হলো তিনি চশমা পরছেন। চশমায় এখনো অভ্যস্ত হন নি। কিছুক্ষণ পর পর তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। চশমা খুলে নিয়ে পাঞ্জাবির খুঁট দিয়ে অনেকক্ষণ ঘষাঘষি করেন। এই সময় তিনি চারদিকে অসহায়ের মতো তাকান।

আমরা যাচ্ছি হন্টন পীরের খোঁজে। বাবা হন্টন পীরের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিবেন। তিনি নিজেও পীর সাহেবের কাছ থেকে দোয়া নিবেন। তাঁর মামলা সতেরো তারিখ কোর্টে উঠছে।

বাবলু!

জি।

খেলাধুলার কথা মনে রাখবি। ইনডোর গেমস না, আউটডোর গেমস। ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, এইসব।

জি আচ্ছা।

মূল কথা একসারসাইজ। হাঁটাহাঁটিও একটা একসারসাইজ। এই যে আমরা হাঁটছি, আমাদের একসারসাইজ হচ্ছে। ব্লাড সারকুলেশন বাড়ছে। ফ্যাট কাটা যাচ্ছে। শরীরের জন্যে ফ্যাট অতি ভয়াবহ। হাঁটা মানে ফ্যাটের দফারফা।

আমি বললাম, তোমার হন্টন পীর সাহেবের শরীরে নিশ্চয়ই কোনো ফ্যাট নেই। তিনি তো হাঁটার উপরই আছেন।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে উনাদের মিলাবি না। উনারা হলেন মজনুন।

মজনুন কী ?

মজনুন হলো দিওয়ানা। আল্লাহর প্রেমে দেওয়ানা। এরা হাঁটলেও যা, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলেও তা। চাঁদপুরের এক পীর সাহেবের সন্ধান পেয়েছি, তিনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর নাম বগা পীর। বক যেমন এক পায়ে দাঁড়ায় উনিও তাই। সূর্য ওঠার আগে দাঁড়ান। সূর্য ডোবার পর পা নামিয়ে আস্তানায় চলে আসেন। ঠিক করেছি তাকে একবার দেখতে যাব। এই জাতীয় মহাপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার মধ্যেও পুণ্য আছে। তুইও চল। বাপ বেটা একসঙ্গে দেখে আসি। যাবি ?

হুঁ।

গুড বয়। মামলায় যদি খালাস পেয়ে যাই তাহলে যেদিন খালাস পাব সেদিনই রওনা দেব। লঞ্চে যেতে দুই আড়াই ঘণ্টা লাগে, কোনো ব্যাপারই না! ভালো কথা, বাসায় মামলা নিয়ে তোর মা কিছু বলে ?

না।

তোদের মধ্যে মিটিং-টিটিং হয় না ?

আমার সঙ্গে হয় না। ভাইয়ার সঙ্গে হয়তো হয়। আমি জানি না।

কোনো আলাপই না ?

না।

মনে হয় শেষ মুহূর্তে তোর মা মামলা তুলে নেবে। পৃথিবীর কোনো মা তার সন্তানদের বাবাকে জেলে পাঠায় না। মা'র কাছে সন্তানের চেয়ে বড় কিছু নাই। সন্তানের বাবাও এই কারণে তুচ্ছ না। বুঝলি ?

হুঁ।

মামলা তোর মা শেষ মুহূর্তে উঠিয়ে নেবে, এই বিষয়ে আমি একশ' পারসেন্ট নিশ্চিত। স্বপ্নে পেয়েছি।

স্বপ্নে কী পেয়েছ ?

স্বপ্নে তোর মা'কে দেখলাম। সে ছড়তা দিয়ে সুপারি কাটছে। মুখের দৃষ্টি কঠিন। আমি বললাম, তুমি তো পান খাও না। সুপারি কাটছ কী জন্যে ?

সে কিছুই বলল না। তারপর দেখি পান বানাচ্ছে। আমি আশ্চর্য হলাম, কার জন্যে পান বানাচ্ছে ? তারপর সে পানটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

আমি বললাম, এর থেকে তোমার ধারণা হলো যে মা মামলা তুলে নেবে ?

অবশ্যই।

বাবা কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করলেন। অনেকখানি হাঁটা হয়েছে। পীর সাহেবকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাবাকে খুবই ক্লান্ত লাগছে। যখনই কোনো খালি রিকশা দেখছেন আগ্রহ নিয়ে তাকাচ্ছেন। উনার কাছে টাকা থাকলে রিকশায় উঠে পড়তেন। বুঝতে পারছি, টাকা নেই। আমার কাছে আছে। আমি রিকশা ভাড়া করলে বাবা লজ্জা পাবেন। এই লজ্জাটা তাঁকে দেবার প্রয়োজন নেই।

বাবলু!

জি।

হাঁটার বিরাট উপকারিতা আছে, এটা মাথায় রাখবি।

জি আচ্ছা।

অতিরিক্ত হাঁটাও আবার ঠিক না। কোনো জিনিসই অতিরিক্ত ভালো না। ইংরেজিতে বলে— 'Too much of everything is bad'. বাগধারা। ইংরেজি বাগধারা।

বাবা, তুমি মনে হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। চল কোথাও বসি, বিশ্রাম করি।

আইডিয়া খারাপ না। পাঁচ-দশ মিনিট বসে এক কাপ চা আর একটা সিগারেট খেয়ে রওনা দিতে পারলে ভালো হতো। নবউদ্যমে যাত্রা। নজরুলের গানের মতো। গান আছে না— 'চল চল চল... ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল...'। গানটার মধ্যে যে ভুল আছে, খেয়াল করেছিস ?

কী ভুল ?

ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল— এই কথাটাই তো ভুল। গগন হলো আকাশ। আকাশে মাদল বাজবে কীভাবে ? ভুল বলেছি ?

রাস্তার মোড়ে ফ্লাস্কে করে চা কফি দুটাই বিক্রি হচ্ছে। বাবা মানিব্যাগ খুলে ভালো মতো দেখলেন। আমিও আড়চোখে দেখলাম। মানিব্যাগে দশ টাকার একটা নোট। এই তাঁর সম্বল।

দু'টাকা করে কাপ। দু'কাপ চা এবং বাবার একটা সিগারেটে চলে গেল ছয় টাকা। বাবার তৃষ্ণা মিটে নি। তিনি উসখুস করছেন। আমি বললাম, চা আরেক কাপ খাও।

বাবা বললেন, খাওয়া যেতে পারে। এরা চা-টা ভালো বানিয়েছে। তুই খাবি ? আমার কাছে চার টাকা আছে। দুই কাপ চা হবে।

আমি বললাম, তুমি এক কাপ চা এবং একটা সিগারেট খাও। আমি খাব না।

বাবা বললেন, ঠিক আছে খাই। খেয়ে পুরোপুরি নিঃস্ব। তবে নিঃস্ব হবার মধ্যেও আনন্দ আছে। পৃথিবীর সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসীও নিঃস্ব। নিঃস্ব অবস্থায় পথ চলা আনন্দের, আবার মানিব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে পথ চলাও আনন্দের।

বাবা, তোমার টাকা-পয়সার অবস্থা কি খারাপ ?

একটু ইয়ে যাচ্ছে। মানুষের জীবনে উত্থানপতন আছে না ? এই বিষয়েও একটা ইংরেজি বাগধারা আছে। এখন ভুলে গেছি।

এখন কি তোমার পতন ?

হুঁ। ভাটা চলছে। সমুদ্রের জীবনে যেমন জোয়ার-ভাটা আছে, মানুষের জীবনেও আছে। মানুষের সঙ্গে এই জায়গাতেই সমুদ্রের মিল।

পীর সাহেবকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। উনি আজ বের হন নি। আস্তানায় ছিলেন। আমরা শুধু শুধুই উনার খোঁজে পথে পথে ঘুরেছি।

পীর সাহেবের চেহারায় বালক-ভাব আছে। ফর্সা মুখ, বড় বড় চোখ। চোখ জ্বলজ্বল করছে। মুখভর্তি দাড়ি থাকবে ভেবেছিলাম, দাড়ি নেই। তাঁর পরনে অতি নোংরা এক কাঁথা। কাঁধের ওপর আরেক কাঁথা। সেটাও নোংরা। হাত-পায়ের নখ মনে হয় তিনি কাটেন না। নখ বড় হয়ে পাখির ঠোঁটের মতো বেঁকে গেছে। পায়ের তলার চামড়া ফেটে ফেটে গেছে। ভেতরের লাল মাংস দেখা যাচ্ছে। পীর সাহেবের কোলে অ্যালুমিনিয়ামের লোটা। মাঝে মাঝে লোটা মুখে নিয়ে চুমুক দিচ্ছেন। লোটায় কী আছে কে জানে। ভালো কিছু নিশ্চয়ই না। লোটার জিনিস মুখে দেয়ার পর পর তার চোখ-মুখ কিছুক্ষণের জন্যে কুঁচকে

যাচ্ছে। তাঁর বাঁ হাতে সিগারেট। হঠাৎ হঠাৎ তিনি সিগারেটে টান দিচ্ছেন। মনে হয় সিগারেটের প্রতি তাঁর তেমন আগ্রহ নেই। পীর সাহেবকে ঘিরে চৌদ্দ-পনেরোজন মানুষের একটা জটলা। এর মধ্যে বোরকা পরা দু'জন মহিলাও আছেন।

বাবা পীর সাহেবকে কদমবুসি করলেন। আমাকেও ইশারা করলেন কদমবুসি করতে। আমি তাঁর নির্দেশ পালন করলাম। বাবা হাত জোড় করে বললেন, আমার ছেলে, নাম বাবলু, আপনি একটু দোয়া করে দেন।

পীর সাহেব কিছুক্ষণ মাথা নাড়লেন। এটাই মনে হয় তাঁর দোয়া।

বাবা বললেন, আমার জন্যেও হুজুর একটু দোয়া করতে হবে। মামলা মোকদ্দমায় পড়ে গেছি।

পীর সাহেব আগ্রহী গলায় বললেন, কী মামলা ? ফৌজদারি না দেওয়ানি ?

ফৌজদারি। জেল হয়ে যেতে পারে। জেলে যাওয়াটা আটকান।

পীর সাহেব বললেন, দুনিয়াটাই তো জেল। এক জেল থেকে আরেক জেলে যাবি, অসুবিধা কী ?

পীর সাহেবের অতি জ্ঞানগর্ভ কথায় অনেকেই অভিভূত হলো। বুঝদারের মতো মাথা নাড়তে লাগল। বাবা করুণ গলায় বললেন, আপনার দরবারে এসেছি, আমার জেলে যাওয়াটা আটকান।

পীর সাহেব বললেন, আল্লাহপাকের নাম কয়টা জানিস ?

নিরানব্বইটা।

কোরআন শরীফে নাম আছে নিরানব্বইটা। কিন্তু উনার নাম সর্বমোট তিন হাজার। এক হাজার নাম জানে ফেরিশতারা। এক হাজার জানেন পয়গম্বররা। নয়শ' নিরানব্বইটা আছে চাইর কিতাবে। বাকি থাকল কত ?

একটা বাকি।

যে নামটা বাকি সেটা ইসমে আজম। এই পাক নাম আল্লাহ গোপন রেখেছেন। কেউ কেউ সেই নামের সন্ধান পায়। যারা পায় তারা...

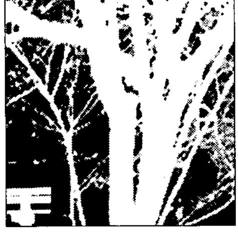
পীর সাহেব চোখ বন্ধ করে ফেললেন। ইসমে আযমের সন্ধান তিনি পেয়েছেন এরকম মনে হলো।

পীর সাহেব একসময় চোখ মেলে ইশারায় বাবাকে কাছে আসতে বললেন। বাবা তার কাছে গেলেন। পীর সাহেব তাঁর পাখির ঠোঁটের মতো নখ দিয়ে বাঁ হাতে বাবার কপালে কী যেন কাটাকাটি করে হৃষ্ট গলায় বললেন, যা তোর

কপালে আসল জিনিস লিখে দিয়েছি। এর নাম ইসমে আযম। হাকিম একবার যদি তোর দিকে তাকায়, তোর কপালের দিকে তাকায়, তাহলে ইসমে আযম তার দিলে ধাক্কা দিবে। তোরে খালাস করা ছাড়া তার কোনো পথ নাই।

ভুঁড়িওয়ালা বেঁটে এক লোক বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, হুজুরের আজকে দিলখোশ বলে এত বড় জিনিস পেয়ে গেলেন। আপনি বিরাট ভাগ্যবান। বসে আছেন কেন ? হুজুরকে কদমবুসি করেন।

বাবা কদমবুসি করলেন। আমিও করলাম। ইসমে আযম যিনি জানেন তাঁকে কদমবুসি না করে উপায় আছে ?



আজ সতেরো তারিখ।

বাবা কপালে অদৃশ্য ইসমে আযম নিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। বারবার কারণে অকারণে জাজ সাহেবের দিকে হাসিমুখে তাকাচ্ছেন। তাঁর ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটায় তিনি বেশ মজা পাচ্ছেন। একবার আমাদের দিকেও তাকালেন।

আমরা তিনজন এসেছি। মা, ভাইয়া এবং আমি। মা বসেছেন মাঝখানে, আমরা দুই ভাই মায়ের দুই দিকে।

ভাইয়ার চোখ-মুখ শক্ত। তার দুটা হাতই কাঁপছে। এই তুলনায় মা স্বাভাবিক। তিনি ভাইয়াকে কনুই দিয়ে খোঁচা দিয়ে বললেন, মাগিটা তার মেয়ে নিয়ে আসে নাই? মাগিটা কই?

ভাইয়া কঠিন গলায় বললেন, মা, চুপ করে থাক তো।

আমাদের পক্ষের উকিল তার মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করার মতো ডানহাত মাথার ওপর দিয়ে বুলাচ্ছেন। তার মুখ এবং চোখ দেখে মনে হচ্ছে, তিনি আজ একটা ম্যাজিক দেখাবেন। আদালতে বেশ হৈচৈ হচ্ছে। জাজ সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, অর্ডার! অর্ডার! এতে আদালতের হৈচৈ কমল না। হৈচৈ হতেই থাকল। আমাদের উকিল বললেন, ইয়োর অনার, আপনার অনুমতি সাপেক্ষে আমি একটা ক্যাসেট আপনাকে শোনাতে চাই।

জাজ সাহেব অনুমতি দিলেন কি দিলেন না তা বোঝা গেল না। তবে আমাদের উকিল ক্যাসেট চালু করলেন। চাইনিজ রেস্টুরেন্টে রেকর্ড করা বাবা-মায়ের কথাবার্তার ক্যাসেট। বাবার হাসি হাসি মুখ হঠাৎ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। তিনি এদিক-ওদিক তাকালেন। চোখ থেকে চশমা খুলে পাঞ্জাবির খুঁটে কাচ পরিষ্কার করতে লাগলেন।

আমাদের উকিল ক্যাসেট বন্ধ করে বাবার কাছে এগিয়ে গেলেন। ধমকের গলায় বললেন, ক্যাসেটে এতক্ষণ যে পুরুষকণ্ঠ শুনলাম সেটা কি আপনার?

বাবা জবাব দিলেন না। চিন্তিত মুখে আমার দিকে তাকালেন। এক পলক তাকালেন মা'র দিকে। তাকিয়েই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন।

উকিল সাহেব আবারো বললেন, কথার জবাব দিন। পুরুষকণ্ঠটি কি আপনার?

দ্রুত বিচার আইনের মামলা। একদিনেই রায় হয়ে গেল। ছয় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। আমাদের উকিল কপালের ঘাম মুছতে মুছতে মা'র কাছে এসে বললেন, বুবু, আপনাকে কথা দিয়েছিলাম সাত বছর। সাত বছর পারলাম না। সরি। এবারের জন্যে ক্ষমা করে দিন।

মা বললেন, মাগিটা আসে নাই? মাগিটার মুখের ভাব দেখার ইচ্ছা ছিল।

উকিল সাহেব বললেন, উনি আসেন নাই।

মাগিটার নাম যেন কী?

মালতী।

হিন্দু না-কি?

জি হিন্দু।

মা এমনভাবে চমকে উঠলেন যেন তাঁকে সাপে কামড়েছে। এতটা চমকানোর কারণ ছিল না। বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী হিন্দু এবং তাঁর নাম মালতী— এই তথ্য মা জানেন। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে আলাপ হয়েছে।

মালতী যদি মুকুল ভাইয়ের কোনো নাটকে অভিনয় করতেন তাহলে খুব বকা খেতেন। বিস্মিত হবার অভিব্যক্তি তাঁর আসছে না। তিনি বোকার মতো আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর নাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

মুকুল ভাই ডিরেক্টর থাকলে চিৎকার করে বলতেন, অ্যাক্সপ্রেশন দাও। অ্যাক্সপ্রেশন। এত বড় খবর প্রথম শুনলে! তোমার স্বামীর ছয় বছরের জেল। অ্যাক্সপ্রেশন কোথায়? চোখ বড় বড় করে তাকাও। ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেল।

মালতী (বাবা যাকে বিয়ে করেছেন তাঁকে নাম ধরে ডাকতে খারাপ লাগছে, কিন্তু কী করব, আর কিছু মুখে আসছে না) প্রায় ফিসফিস করে বললেন, উনার ছয় বছরের সাজা হয়েছে?

আমি বললাম, জি।

জেলখানায় নিয়ে গেছে?

জি।

আপিল হবে না? আপিল?

আমি তো জানি না।

আজ যে তার মামলা এটাও আমাকে বলে নাই। ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ল। কোনোদিন নামাজ পড়ে না, আজ পড়েছে। তারপর বলল, জরুরি কাজ আছে। ফিরতে দেরি হবে। তুমি যদি এসে আমাকে না বলতে তাহলে তো আমি জানতামই না যে, তাকে জেলখানায় নিয়ে গেছে।

আমি চুপ করে আছি। বলার তো নেইও কিছু।

বাবলু, এখন আমি কী করব বলো? কার কাছে যাব?

ঢাকায় আপনার কোনো আত্মীয় নেই?

না। খুলনায় আমার বড়বোন থাকেন। তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। বাবা, তুমি একটু বসো।

উনি হঠাৎ করেই ছুটে শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন। আমি চাপা গলার কান্না শুনতে পাচ্ছি। যূথী আগের মতোই খেলনা নিয়ে খেলছে। আমি তার সামনে বসলাম।

যূথী কী করো?

খেলছি।

আজ কি তোমার জ্বর আছে?

না।

তুমি কি ছবি আঁকতে পার?

পারি।

আমাকে একটা ছবি এঁকে দাও।

রঙপেন্সিল নাই তো। বাবাকে বলেছি। বাবা কিনে দেবে, তখন আঁকব।

আমার নাম কি তোমার মনে আছে?

আছে। বাবলু ভাইয়া।

যূথীর মা প্রায় আধঘণ্টা পরে দরজা খুললেন। তাঁর চোখ-মুখ ফোলা। নাক দিয়ে পানি ঝরছে। তিনি সহজ গলায় বললেন, বাবা, চা খাবে? চা করি?

না।

যূথীর বাবাকে যখন জেলে নিয়ে যাচ্ছিল তখন কি সে কিছু বলেছে?

না। আপনার কাছে কি টাকা আছে?

সতেরশ' টাকা আছে।... ঠিক আছে বাবা, তুমি যাও। তুমি বসে থেকে কী করবে?

সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলাম। বাড়িতে হালকা উৎসবের আমেজ। মা মিলাদের ব্যবস্থা করেছেন। বাদ মাগরেব মিলাদ হবে। মিলাদের শেষে হাজির তেহারি। মা নিজে নতুন (কিংবা ইস্ত্রি করা) শাড়ি পরেছেন। সাজগোজও মনে হয় করেছেন। তাঁকে সুন্দর লাগছে।

নীলা ফুপুকেও সুন্দর লাগছে। তার কারণ অবশ্যি ভিন্ন। তিনি হেভি সাজ দিয়েছেন। নতুন এক অল্পবয়েসী পরিচালক মিউজিক ভিডিও করছে। তিনিও একজন মডেল। আমাকে দেখে নীলা ফুপু বললেন, ভাইজানকে নাকি জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে?

আমি বললাম, হুঁ।

নীলা ফুপু বললেন, ভাইজানের একটা শিক্ষা হওয়া দরকার ছিল। তবে এতদিনের জেল না হয়ে তিন-চার বছরের হলে ঠিক হতো।

আমি বললাম, তোমাকে সুন্দর লাগছে ফুপু।

ফুপু আনন্দিত গলায় বললেন, ফুল মেকাপ এখনো নেওয়া হয় নি। চোখ আঁকা বাকি। কপালের টিপ মাঝখানে হয়েছে নাকি দেখ তো।

হয়েছে।

আমার সমস্ত টেনশন টিপ নিয়ে। তাড়াহুড়া করে যখন টিপ দেই তখন মাঝখানে পড়ে। সময় নিয়ে যখন দেই তখন হয় ডানে বেশি যাবে কিংবা বামে বেশি যাবে।

আনন্দিত মানুষজন দেখতে ভালো লাগে। ফুপুকে দেখতে ভালো লাগছে। তাঁর ভাইজানের দুঃখও তাঁকে স্পর্শ করছে না। তিনি এখন মিউজিক ভিডিওর জন্য তৈরি।

আমি বললাম, গান কোনটা হবে ফুপু?

ফুপু বললেন, 'কূলহারা কলংকিনী'টা হবে। ফোক গান, কিন্তু করা হবে মডার্ন ফরম্যাটে। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, তুই আমাকে একটা ক্যাব ডেকে দে। বলবি উত্তরা যাব।

ফুপুর জন্যে ক্যাব ডাকতে হলো না। মিউজিক ভিডিওওয়ালারা একটা মাইক্রোবাস পাঠিয়েছে। ফুপুর আনন্দের সীমা রইল না। যেন তিনি তাঁর নিজের কেনা গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন এমন অবস্থা।

মাগরেবের নামাজের পর মিলাদ হলো। যে মাওলানা মিলাদ পড়াতে এসেছেন তিনি খুবই হতাশ। কারণ মিলাদে আর কেউ আসে নি। আমি একা। মাওলানা সাহেব বললেন, লোকজন কই ?

আমি বললাম, লোকজন নেই, আমি একা। আমার বড়ভাই থাকতেন কিন্তু উনার মাথা ধরেছে, উনি দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছেন। আপনি শুরু করে দিন।

তুমি আর আমি ? আর কেউ আসবে না ?

না।

এমন মিলাদ আমি আগে পড়াই নাই। কি বলো শুরু করব ?

জি, শুরু করে দিন।

কিসের উদ্দেশ্যে মিলাদ এটা বলো। সেইভাবে দোয়া করতে হবে।

একজনকে জেলে ঢুকানো গেছে, সেই আনন্দে মিলাদ।

কাকে জেলে ঢুকানো হয়েছে ?

আমার বাবাকে।

মাওলানা সাহেব কথা বাড়ালেন না। মিলাদ শুরু করে দিলেন।

ইয়া নবী সালাম আলাইকা।
ইয়া রসুল সালাম আলাইকা।

হে নবী, আপনার প্রতি সালাম।
হে রসুল, আপনার প্রতি সালাম।



কয়েক দিন ধরে 'দি ইমেজ' তালাবন্ধ। কলাপসেবল গেটে বিরাট তালা ঝুলছে। তালার সঙ্গে নোটিশ—

অনিবার্য কারণে দোকান বন্ধ।
সম্মানিত গ্রাহকদের অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

দি ইমেজ-এর সম্মানিত গ্রাহকদের একজন আমার বড়খালা। তাঁর চূড়ান্ত রকমের অসুবিধা হচ্ছে। নতুন ছবি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। অন্য ভিডিওর দোকান থেকে আনা যায়। তার জন্যে মেম্বার হতে হবে। মেম্বারশিপ ফি পাঁচশ' টাকা। বড়খালা এই টাকা খরচ করবেন না।

আমি বললাম, বড়খালা, পাঁচশ' টাকা কি তোমার কাছে কোনো টাকা ?

বড়খালা বললেন, অবশ্যই টাকা। পাঁচশ' টাকা তো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আমার কোলে পড়ে না। যে মাটি কাটে তাকে পাঁচশ' টাকার জন্য পুরো এক সপ্তাহ মাটি কাটতে হয়।

যতই দিন যাচ্ছে তুমি ততই কৃপণ হয়ে যাচ্ছ। এত টাকা তুমি করবে কী ?

গাধা! এটা কি আমার টাকা ? তোর খালুর টাকা। অন্যের টাকা খরচ করা যায় না। গায়ে লাগে।

অন্যের টাকা বড়খালা যে একেবারেই খরচ করেন না, তা-না। তিনি পুরনো এসি বিক্রি করে স্প্লিট এসি লাগিয়েছেন। শব্দহীন এসি। ঠাণ্ডাও হয় অতি দ্রুত। বড়খালার গরম তাতেও কমে না। তিনি গায়ে শাড়ি রাখতে পারেন না। গরমে হাঁসফাঁস করেন।

বাবলু! দেখ না বাপধন, একটা ছবি এনে দিতে পারিস কি-না। জহিরকে বললেই ব্যবস্থা করবে। সেই না-কি দি ইমেজ-এর মালিক।

কে বলল তোমাকে ?

খবর পাই।

খবর কীভাবে পাবে, তুমি তো সারাদিন ঘরেই থাক। কেউ তোমার ঠাণ্ডাঘরে আসেও না।

তারপরেও খবর পাই। তোর বাপকে যে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে সেই খবরও পেয়েছি। কত দিনের কয়েদ হয়েছে ?

ছয় বছর।

জেলে নয় মাসে বছর হয়। ছয় বছর কোনো ব্যাপারই না। একটাই সমস্যা, গরমে কষ্ট পাবে। জেলে ফ্যানের কারবার নেই। ধুন্ধুমার গরম।

জহির ভাই তালাবন্ধ দি ইমেজ-এর ভেতরেই আছেন। সুখেই আছেন। সারাদিন না-কি বাথটাবে শুয়ে থাকেন। সন্ধ্যার পর বিছানায় শুয়ে পুরনো ম্যাগাজিন ঘাঁটেন। আমাকে দেখে প্রথমেই বললেন, কয়টা বাজে ?

আমি বললাম, ঘড়ি নাই। বলতে পারব না কয়টা বাজে।

তোকে ঘড়ি দেয়ার কথা ছিল, দেয়া হয় নি। কাল দুপুর বারোটার দিকে আসিস, ঘড়ির ব্যবস্থা হবে।

ঘড়ি লাগবে না। বড়খালার জন্যে কয়েকটা ছবির ব্যবস্থা কর।

দোকানে যা আছে নিয়ে যা। ভিডিওর দোকান উঠিয়ে দিয়েছি।

উঠিয়ে দিয়েছ কেন ?

ভালো লাগে না। তোর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না। তুই বিদেয় হ। কাল দুপুর বারটায় চলে আসবি। ঘড়ি পাবি।

ঘড়ি লাগবে না।

অবশ্যই লাগবে। লাগবে না মানে!

দুপুর বারটায় জহির ভাই আমাকে কাকরাইলের এক অফিসে নিয়ে গেলেন। চারতলায় সুন্দর অফিস। অফিসের নাম 'মনিটর'। ফিল্মপাড়ায় অফিস। নায়ক-নায়িকার ছবি দিয়ে অফিস সাজানো। লোকজন আসছে যাচ্ছে। জমজমাট ভাব। জহির ভাই দরজা ঠেলে ঢুকলেন। আমিও ঢুকলাম এবং হকচকিয়ে গেলাম। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে মুকুল ভাই বসে আছেন। তিনি পুরোপুরি বুড়ো হয়ে গেছেন। তাঁর গলার চামড়া ঝুলে গেছে। চোখ ঝুলে গেছে। মানুষ হাঁটার সময় কুঁজো হয়ে হাঁটে, তিনি বসে আছেন কুঁজো হয়ে। জহির ভাই বললেন, ভালো আছেন ?

মুকুল ভাই মাথা তুলে তাকালেন। মনে হলো তিনি আমাদের চিনতে পারছেন না।

আপনার শরীর কেমন খোঁজ নিতে এসেছি। শরীর ভালো তো ?

মুকুল ভাই এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। বুড়োদের মতোই খুকখুক করে কাশতে লাগলেন।

কোনো শারীরিক সমস্যা হচ্ছে না ?

মুকুল ভাই বিড়বিড় করে কী যেন বললেন কিছু বোঝা গেল না। কাচের পার্টিশান দেয়া অফিস। পার্টিশানের ওপাশে দু'জন কাজ করছে। তিনি হতাশ চোখে তাদের দিকে তাকালেন। তাদের একজন এই ঘরে ঢুকল। জহির ভাই তার দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে বললেন, ভাই, আমাকে একটু চা খাওয়াতে পারেন ?

সেই লোক বলল, অবশ্যই চা হবে। লেবু চা চলবে ?

লেবু চা খুব ভালো চলবে।

জহির ভাই আরাম করে চেয়ারে বসেছেন। আমাকে ইশারা করলেন দূরের চেয়ারটায় বসতে। আমি তাই করলাম।

মুকুল ভাই বললেন, আমার কাছে কী চান ?

জহির ভাই বললেন, কিছু ক্যাশ টাকার দরকার ছিল। ব্যবস্থা করে দিন।

মুকুল ভাইয়ের মুখ ঝুলে গেল। জহির ভাই হাসিমুখে বললেন, আপনার ঐ ক্যামেরাম্যান লিয়াকত, তার খবর পত্রিকায় পড়ে মনটা খারাপ হয়েছে। সন্ত্রাসীর হাতে মৃত্যু। So sad! আপনার তো ডান হাত চলে গেলরে ভাই।

মুকুল ভাই বললেন, আপনার কত টাকা দরকার ?

দুই লাখ।

অফিসে দশ হাজার টাকা আছে।

তাই তো থাকবে। অফিসে বেশি টাকা থাকা ঠিক না। আপনি চেক লিখে কাউকে ব্যাংকে পাঠিয়ে দিন। আমি অপেক্ষা করি। ভালো কথা, আপনার হাতের ঘড়িটা রোলেক্স না ? যাবার সময় ঐটাও দিয়ে দিবেন। ঘড়ির অভাবে সময় বুঝতে পারি না।

আমরা লেবু-চা খাচ্ছি। মুকুল ভাই চেক লিখে কাকে যেন পাঠিয়েছেন। জহির ভাইকে খুব হাসিখুশি মনে হচ্ছে। পা দোলাচ্ছেন। দেয়ালে টাঙানো নায়ক-নায়িকার ছবি দেখছেন। যেন তিনি খুবই মজা পাচ্ছেন।

মুকুল সাহেব!

জি।

আপনি বলেছিলেন অভিনয়ের জন্যে অডিশন নেবেন। হাতে তো সময় আছে, অডিশন নিয়ে নেবেন নাকি ?

মুকুল ভাই একধরনের চাপা আওয়াজ করতে লাগলেন। তাঁর চোখে ঘৃণা নেই, রাগ নেই, হতাশা নেই। তার চোখে নির্লিপ্ততা। যেন জগতের কোনো কিছুর সঙ্গেই তাঁর কোনো যোগ নেই।

দুপুর একটা পঁচিশে (রোলেক্স টাইম) জহির ভাই দুই লক্ষ টাকা এবং একটা রোলেক্স ঘড়ি নিয়ে বের হয়ে এলেন। রাস্তায় নেমে হালকা গলায় বললেন, ঘড়িটা রাখ। আর শোন, আমি কিছু দিনের জন্যে ডুব মারছি। দেশের বাইরে চলে যাব। তুই ভালো থাকিস।

ঘড়িটা আমি নেব না জহির ভাই।

অবশ্যই নিবি। নিবি না মানে ? সাধু সাজতে চাস ? দুনিয়াতে সাধু বলে কিছু নাই। দুনিয়া হলো ভণ্ডের জায়গা। কেউ বেশি ভণ্ড কেউ কম ভণ্ড। নে ঘড়ি।

না।

ঘড়িটার দাম কত জানিস ? খুব কম করে ধরলেও এক লাখ। তুই নিবি না ?

না।

গুড!

জহির ভাই এক লাখ টাকা দামের ঘড়ি নর্দমায় ফেলে নির্বিকার ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করেছেন। একবার শুধু পেছনে ফিরে আমাকে দেখলেন। হাসিমুখে হাত নাড়লেন। উনার সঙ্গে এটাই আমার শেষ দেখা।

বাসায় ফিরলাম সন্ধ্যা সন্ধ্যায়। সেখানে হুলুস্থুল কাণ্ড। বাসার সামনে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দি ইমেজ-এর সামনে পুলিশের গাড়ি। একটা টিভি চ্যানেলের গাড়ি। প্রচুর লোকজন।

আমাদের বসার ঘরে রমনা থানার ওসি সাহেব বসে আছেন। ভাইয়া তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। দরজার ওপাশে মা দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মাঝে মধ্যে পর্দা ফাঁক করে দেখছেন।

জানা গেল, দি ইমেজ-এর বাথটাবে (জহির ভাইয়ের কেনা গোল বাথটাব) শিয়ালমুত্রার ডেডবডি পাওয়া গেছে। কেউ তাকে গলা টিপে মেরে বাথটাবের পানিতে ডুবিয়ে রেখেছে।

আমি দুপুরে জহির ভাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম। জহির ভাই তার ঘর থেকে বললেন, ভেতরে ঢুকবি না, বাইরে দাঁড়িয়ে থাক। আমি ঘরে ঢুকি নি। বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন কী হচ্ছিল ভেতরে ?

ওসি সাহেব আমার সঙ্গে কথা বললেন। হাসি হাসি মুখ। গলার স্বর মিষ্টি। কথা মিষ্টি।

কী নাম তোমার ?

বাবলু।

নাম জিজ্ঞেস করলে ভালো নাম বলতে হয়। বাবলু তো ডাক নাম। ভালো নাম কী ?

মনোয়ার হোসেন।

ভেরি গুড। কী পড় ?

এইবার এসএসসি দিয়েছি।

কিছুদিনের মধ্যেই তো রেজাল্ট হবে, তাই না ?

জি।

রেজাল্ট কেমন হবে ?

এই প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হলো না। ভাইয়া দিল। আগ্রহের সঙ্গে বলল, ওর রেজাল্ট খুব ভালো হবে। সে অসম্ভব ভালো ছাত্র।

ওসি সাহেব বললেন, আমার বড় ছেলেটাও এসএসসি দিয়েছে। পড়াশোনায় কোনো মন নাই। দিনরাত ক্রিকেট নিয়ে আছে। ফেল করবে জানা কথা। যাই হোক, বাবলু তুমি কোন স্কুলে পড় ?

আমি স্কুলের নাম বলতেই ওসি সাহেব অবাক হয়ে বললেন, আমার গাধাটা তো ঐ স্কুল থেকেই এসএসসি দিয়েছে। শামসুলকে চিন ?

জি চিনি। সে খুব হাসাতে পারে। সবাইকে হাসায়।

ওসি সাহেবের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে গেল। তিনি ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, জোকার ছেলে পয়দা করেছি। সারাক্ষণ আছে জোকারির মধ্যে। একদিনের ঘটনা শোনেন, সে তার মার সঙ্গে ইশারায় কথা বলা শুরু করেছে। তার নাকি জবান বন্ধ, কথা বলতে পারছে না। তার মা অস্থির হয়ে আমাকে

টেলিফোন করেছে। আমি ছিলাম একটা মামলার তদন্তে। সব ফেলে ছুটে এসে বললাম, শামসুল, কী হয়েছে রে ব্যাটা ? সে মাথা নিচু করে বলল, মা'র সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম বাবা। এখন বলেন, এই ছেলেকে নিয়ে কী করি ?

ওসি সাহেবের ছেলে আমার সঙ্গে পড়ে, শুধু এই একটি কারণে আমাদের জন্যে সব সহজ হয়ে গেল। ওসি সাহেব দ্বিতীয় কাপ চা খেলেন এবং বললেন, জহিরের সঙ্গে আপনাদের যে কোনো যোগাযোগ নেই-এই বিষয়ে আমি ক্লিয়ার। আপনাদের সাবধান থাকতে হবে। অতি ডেনজারাস এলিমেন্ট। সে যে র‍্যাবের হাতে ধরা খাবে এবং ক্রসফায়ারে যাবে,-এই বিষয়ে আমি একশ' পারসেন্ট নিশ্চিত। পুলিশের খাতায় তার নাম প্রিন্স। চেহারা সুন্দর, এই জন্যেই প্রিন্স। সুন্দর চেহারার ভেতরে কাল ভুজঙ্গ। বাবলু বাবা, ভুজঙ্গ শব্দের অর্থ জানো ?

সাপ।

গুড। ভেরি ভেরি গুড। একটা জিনিস শুধু মাথার মধ্যে রাখবে, তোমরা এই দেশের ভবিষ্যৎ। বড় হয়ে দেশ তোমরা চালাবে। তোমাদের সেইভাবে বড় হতে হবে...

স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ওসি সাহেব এই বক্তৃতা আমাকে দিচ্ছেন না। নিজের ছেলেকে দিচ্ছেন। আবেগে তাঁর চোখ ছলোছলো হয়ে আসছে।



কয়েক দিন অনবরত বৃষ্টি হয়েছে। সব রাস্তায় পানি। এই পানি আরো বাড়বে, কারণ আকাশ কালো করে মেঘ করেছে। বিকেল থেকে বৃষ্টি শুরু হবে। এ বছরে বৃষ্টি বিকেলের দিকে হচ্ছে। সারাদিন আকাশ থাকে মেঘশূন্য। অফিস আদালত ছুটি হবার আগে আগে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করে।

আমার পকেটে কিছু টাকা আছে। বেশি না, একশ' পঁচিশ। মন চাইছে টাকাটা খরচ করে ফেলি। নিঃস্ব অবস্থায় রাস্তায় হাঁটার একধরনের আনন্দ আছে। এটা আমার কথা না, বাবার কথা। বাবার হঠাৎ হঠাৎ দার্শনিক কথাবার্তা বলার অভ্যাস আছে। দার্শনিক কথা বলার পরপরই তিনি খানিকটা উদাস হয়ে যান। তারপর ইংরেজিতে বিড়বিড় করে বলেন, Life, this is life! দার্শনিক কথা বেশির ভাগ তিনি বলেন রিকশায় করে যাবার সময়। একবার তাঁর সঙ্গে যাচ্ছি। তিনি এক হাতে আমাকে ধরে রেখেছেন যেন ঝাঁকুনি খেয়ে পড়ে না যাই। আমাকে বললেন, বাবলু, বল দেখি আমার পকেটে কত টাকা আছে ?

আমি বললাম, জানি না বাবা।

অনুমান কর।

এক হাজার টাকা।

হয় নাই। পঁচাত্তর হাজার তিনশ'।

এত টাকা ?

আমার এই প্রশ্নে বাবা উদাস হয়ে বললেন, পকেটভর্তি টাকা নিয়ে রাস্তায় বের হবার যে মজা, পকেট খালি অবস্থায় রাস্তায় বের হওয়ারও একই মজা।

আমি বললাম, কীভাবে ?

বাবা বললেন, Life, this is life! তখন তার মধ্যে উদাস ভাব চলে এসেছে। তিনি পঁচাত্তর হাজার তিনশ' টাকা পকেটে নিয়ে উদাসী হয়ে পড়েছেন। একটা সময় ছিল যখন তিনি প্রচুর টাকা কামিয়েছেন। তখন তিনি মূর্তির ব্যবসা করতেন। রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর থেকে আমের ঝুড়িতে মূর্তি

আসত। কষ্টি পাথরের মূর্তি, পিতলের মূর্তি, ব্রোঞ্জের মূর্তি। মূর্তি কেনার জন্যে নানান ধরনের লোকজন বাড়িতে ঘোরাঘুরি করত। একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি— আমার ঘরের চেয়ারে জাপানি এক লোক বসে আছে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসতেই সে বাংলায় বলল, কুকা কমন আছ ? বলেই সে হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল। কুকা মানে খোকা, এটা বুঝতেও আমার অনেক সময় লাগল।

বাবার কাছে শুনেছি জাপানি এই সাহেবের নাম নিশিমিশি। তাঁর কাজ হচ্ছে পৃথিবী ঘুরে ঘুরে মূর্তি কেনা। বাবার কাছ থেকে সে শিব-পার্বতীর একটা মূর্তি কিনে নগদ দশ লাখ টাকা দিয়েছিল। নগদ দশ লাখ টাকা আর এক বোতল জাপানি মদ। বাবা মদের বোতল হাতে নিয়ে বলেছিলেন, থাপ্পড় দিয়ে হারামজাদার দাঁত ফেলে দেয়া দরকার ছিল। মুসলমানের বাড়িতে মদ নিয়ে এসেছে, এত বড় সাহস!

সেই মদের বোতল (নাম সাকি) অনেকদিন আমার ঘরের শেলফে রাখা ছিল। একদিন মা সেই বোতল বাথরুমে ভেঙে ফেললেন। পচা ভাতের দুর্গন্ধে বাড়ি ভরে গেল।

বাবা মূর্তির ব্যবসা বেশিদিন করতে পারেন নি। তাঁর মূল যে অ্যাসিসটেন্ট শওকত (আমি ডাকতাম শওকত মামা। খুব ভালো ম্যাজিক দেখাতেন। পয়সার ম্যাজিক। পয়সা অদৃশ্য করে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে বের করতেন।) পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। তার পাঁচ বছরের জেল হয়ে গেল। সেই সময় বাবাও জেলে যাবার জন্য তৈরি ছিলেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন শওকত মামা তার নাম বলবেন। পুলিশ তাকেও এসে ধরে নিয়ে যাবে। শওকত মামা কারো নামই বলেন নি। একা জেল খাটতে গেলেন। দুই বছরের মাথায় নিউমোনিয়ায় জেলখানায় তাঁর মৃত্যু হয়।

শওকত মামার কথা উঠলেই বাবা বলতেন, সে সাধারণ মানুষের পর্যায়ের কেউ না। সে অতিমানব। মহাপুরুষ।

মহাপুরুষদের সংজ্ঞা একেকজনের কাছে একেক রকম।

মেঘলা দিনে মন মেঘলা হয়ে যায়। মেঘলা মন নিয়ে আমি অনেকক্ষণ রাস্তায় হাঁটলাম। একটা স্টেশনারি দোকান থেকে লাল-নীল পেনসিল কিনলাম, খাতা কিনলাম, তারপর রওনা হলাম বাবার ফ্ল্যাট-বাড়ির দিকে। কেন জানি মনে হচ্ছে কাউকে পাব না। ফ্ল্যাট-বাড়িতে তালা ঝুলবে। কিংবা কড়া নাড়ার শব্দে অপরিচিত একজন মহিলা দরজা খুলে বিরক্ত মুখে বলবে, কাকে চাই ?

আমি মিনমিন করে বলব, যূথীর কাছে এসেছিলাম।

মহিলা কঠিন গলায় বলবেন, যূথী বলে এ বাড়িতে কেউ থাকে না। আমরা নতুন ভাড়াটে।

আমি বলব, যূথীরা কোথায় গেছে জানেন ?

তিনি বলবেন, আমাদের তো জানার কথা না।

মুখের ওপর খট করে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ ধরে দরজা নক করছি, কেউ দরজা খুলছে না। দরজার ওপাশে কেউ একজন যে আছে সেটা বুঝতে পারছি। নড়াচাড়ার শব্দ পাচ্ছি। সে যে ছিটকিনি টানাটানি করছে এটাও বুঝতে পারছি।

একসময় দরজা খুলে গেল। দরজার ওপাশে যূথী। সে আমাকে দেখে গায়ের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তার ধাক্কায় আরেকটু হলে আমি পড়েই যেতাম। সে কাঁদতে কাঁদতে যা বলল, তার অর্থ হচ্ছে সকালবেলা তার মা তাকে বলেছে দুই ঘণ্টার জন্য সে বাইরে যাচ্ছে। খুবই জরুরি কাজ। তারপর সারাদিন কেটে গেছে সে আসে নি। যূথী কিছু খায় নি। তার খুব ক্ষিধা লেগেছে।

আমি বললাম, বার্গার খাবে ?

যূথী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, হুঁ। আর কোক খাব।

বিশাল একটা বিফ বার্গার যূথী দুই হাতে ধরে খাচ্ছে। পরপর কয়েকটা কামড় দিয়ে সে বার্গারটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, খাও।

আমি বললাম, তুমি খাও।

না না, তুমি খাও।

ক্ষুধার্ত এই মেয়েটি আমার প্রতি তার মমতা দেখাতে চাচ্ছে। আহা বেচারি। আমি বার্গারে কামড় দিলাম।

সে কয়েক কামড় খায়, তারপর বার্গার আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। আমি এক কামড় খাই। সে অতি দ্রুত কয়েকটা কামড় দেয়, আবার বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে।

যূথীর মা বাসায় ফিরলেন সন্ধ্যার পর। কাঁদতে কাঁদতে ফিরলেন। তাঁর কাছে জানলাম তিনি গিয়েছিলেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে। একজন দালাল ধরেছিলেন। দালাল পাঁচশ' টাকার বিনিময়ে কাজটা করে দেবে বলেছিল।

দালালের কারণে সারাদিন তিনি জেলখানার সামনে বসা। বাবার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাবা, চা খাবে?

আমি বললাম, না।

তিনি শান্ত গলায় বললেন, বাবা, আমি কী করব বলো তো? কোথায় যাব? কার কাছে যাব? আমি কি তোমার মা'র কাছে যাব?

আমি বললাম, তাঁকে কী বলবেন?

তিনি হতাশ গলায় বললেন, তাও তো জানি না। আসলেই তো, আমি কী বলব!



এক বর্ষায় গল্প শুরু করেছিলাম। এখন আরেক বর্ষা। সেই মেঘকালো আকাশ, সেই বৃষ্টি। ঢাকার গাছগুলিতে নতুন পাতা। টোকাই ছেলেমেয়েগুলির হাতে কদম ফুলের গুচ্ছ। ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ি থামছে, এরা ছুটে ছুটে যাচ্ছে— ফুল নিবেন? ফুল? চাইরটা এক টাকা। চাইরটা এক টাকা।

এই এক বছরে কী কী পরিবর্তন হলো বলি— নীলা ফুপুর বিয়ে হয়ে গেল। তিনি বরের সঙ্গে দেশের বাইরে (ইটালি, মিলান শহর) চলে গেছেন। ঢাকা এয়ারপোর্টে তিনি উঁচু হিল পরে বেকায়দায় পা ফেলেছিলেন। পা মচকে ফেললেন। হিল খুলে ফেলতে হলো। তিনি এক হাতে নতুন কেনা হিল জুতাজোড়া নিয়ে খালি পায়ে প্লেনে উঠলেন।

নীলা ফুপুর বরের নাম শামস-উল আলম। তিনি মিলানে এক চকলেট কারখানায় কাজ করেন। তাঁর চেহারা হাবভাব চালচলন সবই 'বান্দরের' মতো। তাঁকে প্রথম দেখে আমার মনে হয়েছিল— স্যুট পরা বান্দর। সাইজে ফুপুর চেয়েও ছোট। এক জায়গায় বসে থাকতে পারেন না। একদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারেন না। বেচারা বউ খুঁজতে দেশে এসেছিলেন। এক বন্ধুর সঙ্গে নাটকের শুটিং কীভাবে হয় দেখতে গেলেন। তখন ফুপুর শট হচ্ছিল। গ্রামের মেয়ে কলসি কাঁখে জল আনতে যাচ্ছেন। এই দৃশ্য দেখে ভদ্রলোক প্রেমে পড়ে গেলেন। অতি দ্রুত বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। মা শুধু একবার বলেছিলেন, ছেলে তো সুন্দর না। চেহারায় হনুমান ভাব আছে। এতেই ফুপু কেঁদেকেটে অস্থির হয়েছেন। বিয়ে হলো খুব ধুমধাম করে। বরপক্ষ নীলা ফুপুকে দুই সেট গয়না দিল। একটা হীরার আংটি দিল। ফুপু আমাকে আংটি দেখিয়ে বললেন, অরিজিন্যাল হীরা, আমেরিকান ডায়মন্ড না। দাম কত বল তো?

জানি না। অনেক দাম।

বাংলাদেশী টাকায় ছাপ্পান্ন হাজার টাকা। এত দাম দিয়ে আংটি কেনার কোনো মানে হয়! টাকা থাকলেই খরচ করতে হবে? আমি ওর সঙ্গে রাগ করেছি। দেখি আংটিটা তোর আঙুলে পর। কেমন লাগে দেখি। আহা, পর না!

আমি কড়ে আঙুলে আংটি পরে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। ইটালি রওনা হবার দিন হঠাৎ ফুপুর তাঁর ভাইজানের কথা মনে পড়ল। তাঁর প্লেন বিকাল তিনটায়, তিনি সকাল এগারোটায় আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, ভাইজানের জন্যে মন খারাপ লাগছে। উনার সঙ্গে দেখা করব। ব্যবস্থা করতে পারবি ?

না। একদিনে ব্যবস্থা করা যাবে না।

গতরাতে ভাইজানকে স্বপ্নে দেখে মন এত খারাপ হয়েছে! কী স্বপ্নে দেখি জানিস ? দেখি ভাইজান সুই-সুতা দিয়ে একটা কাঁথা সেলাই করছেন। আমি তাকে বললাম, এইসব মেয়েদের কাজ, তুমি করছ কেন ? আমাকে দাও। ভাইজান আমার হাতে সুই-সুতা দিতে দিতে বললেন, তুই বিয়ে করলি, আমাকে দাওয়াত দিলি না কেন ? আমি বললাম, দাওয়াত দিব কীভাবে ? তুমি তো জেলে। তখন ভাইজান বললেন, দাওয়াত দিলে একদিনের ছুটি নিয়ে আসতাম। আমাদের জেলখানাটা ভালো। এখানে এরকম সিস্টেম আছে।

ফুপু কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে আমি নাটকের অনেক দৃশ্যে কাঁদতে দেখেছি। বাস্তবের কোনো দৃশ্যে তিনি অনেকদিন পর কাঁদলেন। দৃশ্যটা এত সুন্দরভাবে করলেন যে, আমার চোখে পানি এসে গেল। তিনি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন— বুঝলি বাবলু, অল্প বয়সে আমাদের বাবা মারা গেল। বিরাট সংসার এসে পড়ল ভাইজানের ঘাড়ে। বেচারাকে কত ধান্ধাবাজি করে সংসার টানতে হলো!

ফুপু, কান্না বন্ধ করে গোছগাছ কর। একটার সময় তোমাদের রিপোর্টিং।

ফুপু কান্না বন্ধ করতে পারলেন না।

এয়ারপোর্টে একটা মজার ঘটনার উল্লেখ করতেই হয়। নতুন ফুপা কমপ্লিট স্যুট পরে তিড়িং-বিড়িং করছেন। হাতে সময় নেই, ইমিগ্রেশনে ঢুকে যাবেন। নীলা ফুপু বললেন, ও বাবলু, তোর ফুপাকে সালাম করলি না ? পা ছুঁয়ে সালাম কর। দোয়া নে। আদব-কায়দা শিখিয়ে দিতে হবে— গাধা ছেলে!

আমি পা ছুঁয়ে সালাম করলাম। ফুপা সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে রিস্টওয়াচ খুলে আমার হাতে পরিয়ে দিতে দিতে বললেন, তোমার হাতে ঘড়ি নাই, এটা আগে খেয়াল করি নাই। ঘড়িটা রাখ— একশ' দেড়শ' টাকার সস্তার ডিজিটাল ঘড়ি না। সাতশ' লিরা দিয়ে কিনেছি।

আমি 'না না' করতে যাচ্ছি, নীলা ফুপু আরেকটা ধমক দিলেন— আদর করে তোর ফুপা একটা জিনিস দিচ্ছে, না না করছিস কেন ? একটাই তো তোর ফুপা!

ফুপা ঘড়ি গিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, স্যুটের পকেট থেকে কলম বের করে আমার বুকপকেটে দিয়ে দিলেন। দরাজ গলায় বললেন, পাস করার পর চিঠি দিও, তোমাকে ইটালি নিয়ে যাব। সেখানে সিটিজেনশিপের ব্যবস্থা করে দেয়ার দায়িত্ব আমার। যদি না পারি কান কেটে কুত্তাকে খাওয়ায়ে দিব। শামস-উল আলম এককথার মানুষ।

ইমিগ্রেশনে ঢোকার আগে মেয়েরা শেষ কান্না কাঁদে। ফুপু সেই কান্না শুরু করলেন। ফুপা তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলতে লাগলেন— কাঁদে না লক্ষ্মী, কাঁদে না। প্রতি বছর একবার দেশে আসবে। মাই ওয়ার্ড অব অনার। ফুপা নিজেও কাঁদতে লাগলেন।

কী সুন্দর দৃশ্য! আমি চোখের সামনে তাঁদের অতি সুন্দর সংসার দেখতে পাচ্ছি। নীলা ফুপুর কুৎসিত অতীতের ছায়া এই সংসারে কোনোদিনও পড়বে না। আমাদের বাংলা স্যার বলতেন— জটিল অন্ধকারে কী হয় ? সামান্য জোনাকির আলোতেও অন্ধকার কাটে। ফুপু এবং ফুপার ভালোবাসায় তাঁদের সব অন্ধকার কেটে যাবে।

ভাইয়ার রেজাল্ট হয়েছে। তিনি যথারীতি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন। এতেও তিনি সন্তুষ্ট না। একটা পেপারে না-কি কম নাম্বার পেয়েছেন। কেন কম পেয়েছেন এটা নিয়েই চিন্তিত। লেকচারার হিসেবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন। এটা কোনো বড় কথা না। তাঁর মতো ছেলে তো ইউনিভার্সিটির টিচার হবেই। বড় কথা হলো, মা'র কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভাইয়া একটা গাড়ি কিনেছেন। মরিস মাইনর। গাড়ি এখনো রাস্তায় নামে নি। কারণ আমাদের ড্রাইভার নেই। ড্রাইভার খোঁজা হচ্ছে। ভাইয়া রোজই কারো না কারো ইন্টারভ্যু নিচ্ছেন। কাউকেই তার মনে ধরছে না। প্রতিদিন কিছু সময় তিনি গাড়ির পেছনে ব্যয় করেন। পালকের ঝাড়ন দিয়ে ধুলা ঝাড়েন। হোস পাইপে পানি দিয়ে গাড়ি ধোয়া হয়। একদিন তিনি গাড়ি কীভাবে চলে, ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে, স্পার্ক প্লাগ কী, এইসব নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। পেট্রোল ইঞ্জিনের সঙ্গে স্টিম ইঞ্জিনের তফাতটা কোথায় ? রকেটের ইঞ্জিন কী ?— আমি সব জেনে গেলাম।

বড়খালার ভূত দেখা রোগের আরো উন্নতি হয়েছে। আগে ভূতগুলো থাকত খাটের নিচে, এখন তারা সাহসী হয়েছে। গভীর রাতে খালা যখন টিভি দেখেন তখন তারা খাটের নিচ থেকে বের হয়ে আসে, খালার সঙ্গে টিভি দেখে।

চুপচাপ টিভি দেখলে ঝামেলা ছিল না, কিন্তু তারা নিজেদের পছন্দের প্রোগ্রাম দেখতে চায়। খালা হয়তো নাটক দেখছেন, তারা ফস করে রিমোট টেনে অন্য চ্যানেল দিয়ে দিবে। ভূতরা খালার জীবন অস্থির করে তুলেছে।

ভাইয়ার পরামর্শে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট খালার চিকিৎসা করছেন। সাইকিয়াট্রিস্ট বলছেন খালার রোগের নাম 'ডিল্যুশান অব পারসেপশন'। রোগটা তাঁর শুরু হয়েছে খালু সাহেবের মৃত্যুর পর। কারণ খুঁজতে গিয়ে মজার একটা জিনিস বের হয়েছে, খালু সাহেব তার বিপুল বিষয়-সম্পত্তি, ব্যাংকের ক্যাশ টাকার অতি সামান্য অংশই খালাকে দিয়ে গেছেন। সবই জহির ভাইয়ের নামে। খালা এতদিন তা চেপে রেখেছেন। এই কাজটা খালু সাহেব কেন করেছেন তা বোঝা যাচ্ছে না। কারণ নিশ্চয়ই আছে। সব ঘটনার পেছনে কারণ থাকবে। ভাইয়া যেমন বলেন, প্রথমে Cause তারপর Effect।

এর মধ্যে আমি একবার বাসার কাউকে না বলে কুমিল্লা সেন্ট্রাল জেলে বাবাকে দেখে এসেছি। বাবাকে তারা ঢাকা থেকে কুমিল্লা পাঠিয়ে দিয়েছিল। বাবার সঙ্গে দেখা করার পুরো ব্যবস্থাটা করে দেয় ওসি সাহেবের ছেলে শামসুল। শামসুল সবসময় খেলাধুলা নিয়ে থাকলেও এসএসসি পরীক্ষায় খুব ভালো করে। জিপিএ ফাইভ পায়। শামসুলের কাছে শুনেছি তার বাবা ছেলের রেজাল্টের খবর শুনে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দুই হাত তুলে বলেন, হে আল্লাহপাক, আমি আমার জীবনের সবচে' ভালো সংবাদটা শুনে ফেলেছি। এখন আমার মৃত্যু হলেও কোনো আফসোস নাই।

শামসুল আবার এই অংশটা অভিনয় করে সবাইকে দেখায়। এত সুন্দর অভিনয়! শামসুল ক্রিকেট না খেলে অভিনয় করলে অনেক ভালো করত। জোকারি অভিনয়। সে সবচে' ভালো অভিনয় করে পাগলের। নর্দমার পাশে দাঁড়িয়ে ছোট বাথরুম করার সময় পাগল কী করে সেই অভিনয়। এমনিতে পাগলদের লজ্জাবোধ নেই— শুধু ছোট বাথরুম করার সময় পাগলরা না-কি লজ্জায় মরে যায়।



একটা ছোট্ট জানালা। জানালার একপাশে বাবা, অন্যপাশে আমি। তিনি ইচ্ছা করলেই হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরতে পারেন। তা তিনি করছেন না। মাথা নিচু করে বসে আছেন। মনে হচ্ছে খুব লজ্জা পাচ্ছেন। প্রথম কথা কে বলবে? তিনি বলবেন, না আমি? কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমিই প্রথম কথা বললাম।

বাবা, কেমন আছ?

তিনি মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই তো লম্বা হয়ে গেছিস রে। মাশাল্লাহ, মাশাল্লাহ।

বাবা, তোমার জন্য সিগারেট এনেছি।

আমি তিন প্যাকেট বেনসন অ্যান্ড হেজেস সিগারেট কাউন্টার দিয়ে এগিয়ে দিলাম। তিনি আগ্রহের সঙ্গে সিগারেট নিতে নিতে বললেন, কাজটা ঠিক হয় নাই। ছেলে বাবার জন্য সিগারেট আনবে— এটা কেমন কথা!

তিনি সিগারেটের প্যাকেট নাকের কাছে নিয়ে শুঁকছেন। তাঁর চোখে-মুখে আনন্দ।

বাবলু, বাসার সবাই ভালো?

জি।

নীলাকে কিছুদিন আগে স্বপ্নে দেখলাম। ভালো স্বপ্ন। ছোট ছোট কয়েকটা বাচ্চার সঙ্গে এক্কা দোক্কা খেলছে। নীলা আছে কেমন?

ভালো আছে। নীলা ফুপুর বিয়ে হয়ে গেছে। বরের সঙ্গে ইটালিতে আছেন।

মাশাল্লাহ, মাশাল্লাহ।

ইটালিতে যাবার দিন তোমার কথা মনে করে খুব কান্নাকাটি করেছিলেন।

নীলার মনটা নরম, এটাই হয়েছে সমস্যা। আর ইয়ে, তোর মা? সে নিশ্চয়ই এখন আপসেট। সে তো ভাবে নাই সত্যি সত্যি ছয় বছরের জেল দিয়ে দিবে।

আমি বললাম, বাসার প্রসঙ্গ থাক। তুমি কেমন আছ বলো।

ভালো আছি। আমি খুবই ভালো আছি। জেলখানায় নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হয়। এর উপকার আছে। আর খাওয়া-দাওয়া যতটা খারাপ বাইরে থেকে শোনা যায় তত খারাপ না। সপ্তাহে একদিন মাংস হয়। তারপর বিশেষ বিশেষ দিনে হয় ইমপ্রুভড ডায়েট। যেমন ধর স্বাধীনতা দিবস, দুই ঈদ। ইমপ্রুভড ডায়েটে পোলাও-মাংস-দই কিংবা পোলাও-মাংস-মিষ্টি থাকে। অসুখ-বিসুখ হলে ডাক্তার আছে। তারপর খেলাধুলার ব্যবস্থাও আছে।

তুমি খেলাধুলা কর ?

ভলিবল খেলি। সারাদিন পরিশ্রম করি বলে রাতে ঘুমটা ভালো হয়, শুধু স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলে খুব অস্থির লাগে। বাকি রাত ঘুম হয় না।

প্রায়ই স্বপ্ন দেখ ?

হুঁ। তোকে প্রায়ই দেখি।

কী দেখ ?

রিকশা করে দু'জন যাচ্ছি, এইসব হাবিজাবি।

বাবা, যূথীকে স্বপ্নে দেখ না ?

এই প্রশ্নটা করা ঠিক হয় নি। বাবার চেহারা কেমন যেন হয়ে গেল। তিনি অস্পষ্ট স্বরে বললেন, ওরা কোথায় আছে জানিস ?

আমি বললাম, না।

বাবা বিড়বিড় করে বললেন, তোর জানার তো কথাও না। মালতীর এক বোন থাকে খুলনার বাগেরহাটে। মনে হয় সেখানেই গেছে। সেই বোনের অবস্থাও খুব খারাপ। তারপরেও বোন কি আর বোনকে ফেলে দেবে! কী বলিস ?

আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। বাবা বললেন, জেল থেকে ছাড়া পেয়েই প্রথমে খুলনা যাব। ওদের খুঁজে বের করব। তারপরে নতুন করে সংসার শুরু করব। অনেক বড় বড় লোকজন আমার চেনাজানা। তাদেরকে ধরলে একটা চাকরি পাওয়া আমার জন্যে কোনো ব্যাপারই না। ঠিক না ?

হুঁ ঠিক।

রিয়েল অ্যাস্টেটের ব্যবসা করে সুলেমান শাহ্ এখন কোটিপতি। একসময় তাঁর সঙ্গে বিরাট খাতির ছিল। তাঁকে যদি গিয়ে চাকরির কথা বলি সঙ্গে সঙ্গে দশ-পনেরো হাজার টাকা বেতনের একটা চাকরি হয়ে যাবে। একটা ফ্ল্যাট কেনা দরকার। মেয়েটার নামে ফ্ল্যাট লিখে দিব। মেয়েটার জন্য কিছুই করতে পারলাম না। একটা কিছু তো করা দরকার।

বাবা কাঁদতে শুরু করেছেন। তাঁর চোখের পানি সিগারেটের প্যাকেটে পড়ছে। টপ টপ শব্দ হচ্ছে। আমি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাবার কাঁধ স্পর্শ করলাম। তিনি মাথা ঘুরিয়ে আমার হাতে তাঁর থুতনি রাখলেন। এখন তাঁর চোখের পানি পড়ছে আমার হাতে। একটু আগে টপটপ শব্দ হচ্ছিল। এখন সেই শব্দ হচ্ছে না।

পরিশিষ্ট

বাবা যূথী এবং তার মা'র খোঁজ বের করতে পারেন নি। ষোল কোটি মানুষের দেশে এই দু'জন মনে হয় হারিয়েই গেল। বাবা আশা ছাড়েন নি। তিনি খুঁজেই যাচ্ছেন। বাকি জীবনটা তিনি খুঁজে খুঁজেই পার করবেন।

তিনি কোথায় থাকেন আমি জানি না, কী খান তাও জানি না। তাঁকে দেখায় ভিক্ষুকের মতো। আমার ধারণা তিনি ভিক্ষাও করেন। একদিন তাকে জিজ্ঞেসও করলাম, বাবা, তুমি কি ভিক্ষা কর ? তিনি বিরক্ত গলায় বলেন, ভিক্ষা করব কেন ? আমি কি ভিখিরি ? তবে হঠাৎ হঠাৎ কেউ ভিক্ষুক মনে করে একটা দুটা টাকা দেয়, সেগুলি রেখে দেই। চা বিস্কুট খাই। টাকা কেন রাখি সেটা শুনতে চাস ?

কেন রাখ ?

ওরা টাকা দেয় সোয়াবের আশায়, আমি যদি টাকা না নেই ওরা তো সোয়াবটা পাবে না। খামাখা ওদের বঞ্চিত করার দরকার কী ? ঠিক বলেছি না ?

হুঁ।

তাছাড়া ভিক্ষুকদের ছোট করে দেখারও কিছু নাই। তারাও পরিশ্রম করে উপার্জন করে। সারাদিন হাঁটে। হাঁটা পরিশ্রমের ব্যাপার না ?

বাবা আগের মতোই আছেন। তাঁর চরিত্রের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় নি, তবে 'অহংকার' নামের জিনিসটি ইদানীং যুক্ত হয়েছে। মা তাঁর প্রতি কিছুটা নমনীয় হয়ে একতলার একটি ঘরে তাঁকে থাকতে দিতে চেয়েছিলেন। প্রস্তাবটা মায়ের হয়ে আমিই তাঁকে দিয়েছি। বাবা বলেছেন, আরে না।

আমি বললাম, না কেন ?

বাবা বললেন, আমি তো কোনো জায়গায় স্থির না। ছোটাছুটির মধ্যে আছি। যূথী আর যূথীর মা'র একটা পাত্তা লাগাতে হবে না ? এর মধ্যে তোদের বাড়িতে উঠলে আলস্যে ধরবে। দুপুরে ঘুমাতে ইচ্ছা করবে। আমি এইসবের মধ্যে নাই।

নীলা ফুপু ইটালি থেকে বাবার জন্যে দুশ' ডলার এবং এক প্যাকেট চকলেট পাঠিয়েছিলেন। বাবা চকলেটের প্যাকেটটা রেখেছেন। যূথীর সঙ্গে দেখা হলে তাকে দেবেন। ডলার রাখেন নি। বিরক্ত মুখে বলেছেন, ছোটবোনের কাছ থেকে টাকা নেব এটা কেমন কথা? আমি কি ফকির না-কি?

আমি বললাম, বাবা, তুমি তো ফকিরই।

বাবা রাগ করে উঠে চলে গেছেন। তারপর অনেকদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। যেসব জায়গায় তাকে সাধারণত পাওয়া যায় তার কোনোটিতেই তিনি নেই। কমলাপুর রেলস্টেশন, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল, হাইকোর্টের মাজার, হন্টন পীরের দরবার।

এক বর্ষায় আবার তাঁর সঙ্গে দেখা। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বেঞ্চিতে জবুথবু হয়ে বসে আছেন। আমি পাশে বসলাম। নরম গলায় বললাম, কেমন আছ বাবা? তিনি নিচু গলায় বললেন, প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে, কিছু খাওয়া তো।

আমি বার্গার কিনে নিয়ে এলাম। তিনি আগ্রহের সঙ্গে বার্গারে কয়েকটা কামড় দিয়ে বার্গার আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। কোমল গলায় বললেন, জিনিসটা ভালো বানিয়েছে— এক কামড় খেয়ে দেখ।

এরকম একটা কাণ্ড অনেকদিন আগে যূথী করেছিল। প্রকৃতি একই ঘটনা নানানভাবে সাজায়। কেন সাজায় কে জানে!

বাবলু!

জি বাবা।

মুন্সিগঞ্জে এক পীর সাহেবের সন্ধান পেয়েছি— কামেল মানুষ। উনি হারানো মানুষের সন্ধান নিমিষের মধ্যে দিতে পারেন। ঠিক করেছি উনার কাছে যাব।

আমাকেও সঙ্গে নিও।

না। কাউকে সঙ্গে নেব না।

না কেন?

তিনি জবাব দিলেন না। এই সময় বর্ষার ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে চলে গেল। বাবা বিড়বিড় করে বললেন, আহারে, কী মিঠা লিলুয়া বাতাস!